গৌতম বুদ্ধ এবং তার ধর্ম

শরদিন্দু শেখর চাকমা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Silabanta Bhante

গৌতম বুদ্ধ এবং তার ধর্ম

শরদিন্দু শেখর চাকমা

অঙ্কুর প্রকাশনী

গ্রন্থস্বত্ব
শরদিন্দু শেখর চাকমা

প্রচ্ছদ
মাওদুদুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেস প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪১০৯৩৬

ISBN 984 464 208 6

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

বাংলাদেশসহ দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ জনগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি **সাধনানন্দ মহাস্থবির** যিনি বনভান্তে নামে সমধিক পরিচিত

লেখকের অন্যান্য বই

আমার দেখা ভূটান

ভারত বিভাগ ও জিন্নাহ্‌র ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম, সেকাল একাল

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিকথা এবং
তাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন (প্রথম খণ্ড)

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন (দ্বিতীয় খণ্ড)

আমরা এদেশের নাগরিক এদেশে থাকতে চাই

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে সংখ্যালঘুরা কেমন আছে?

The Untold Story

জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বিপন্ন মানবতা

মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের মেলা, উৎসব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

Ethnic Cleansing in Chittagong Hill Tracts

সূ চি প ত্র

বৌদ্ধ ধর্ম	৯
বৌদ্ধ ধর্ম ও বিজ্ঞান	১২
বিপ্লবী বুদ্ধ	১৪
বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম এবং দর্শন	১৬
বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিকতা	১৮
হীনযান ও মহাযান	২৪
বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতন	২৭
বুদ্ধের জীবন-দর্শন	৬৪
মহামানব বুদ্ধ	৬৮
বুদ্ধ : এক আলোকবর্তিকা	৭০

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ হলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একদিকে তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ববিদ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী এবং সমাজ সংস্কারক। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে বুদ্ধের জন্মের পর তার নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ, তার জন্মের পর তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তখন তাকে লালন পালন করেন বিমাতা গৌতমী। সে জন্য তাঁর অপর নাম হয় গৌতম। বুদ্ধ ছিলেন একজন রাজপুত্র, তাঁর ছিল সুন্দরী স্ত্রী, এক পুত্র। কিন্তু রাজপুত্র হিসেবে ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে, ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণের আশা পরিত্যাগ করে তিনি ভিন্ন ধরনের এক বিপ্লবী জীবন শুরু করলেন। তিনি এক গভীর রাতে গৃহত্যাগ করলেন। এরপর তিনি ৬ বছর কঠোরভাবে কৃচ্ছ্র সাধন করলেন, ধ্যান করলেন; কিন্তু তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন কেবল কৃচ্ছ্র সাধন করে সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এরপর তিনি কৃচ্ছ্র সাধন বাদ দিয়ে মধ্যম পথ ধরলেন এবং এক বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যান করা শুরু করলেন, শুরু করলেন আত্মযুদ্ধ। এরপর পেলেন পরম জ্ঞান, হলেন তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত। তিনি বুঝলেন জীবন মূলত দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরাদুঃখ, রোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, ব্যর্থতার আঘাত দুঃখ, কামনার আঘাত দুঃখ এবং এরকম আরো দুঃখ। এক কথায় আমাদের জীবন দুঃখের আকর। সুখ হয়তো আছে; কিন্তু অনাবিল সুখ বলে কিছুই নেই। যে সুখ আছে, সেটা হল ক্ষণস্থায়ী। বুদ্ধ বুঝতে পারলেন এ জগতে সব কিছুই অনিত্য, সদা পরিবর্তনশীল। কোন জিনিসই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বা স্বয়ং সংঘটিত নয়। একটি ঘটনা অন্য একটি হতে উদ্ভূত। অন্য কথায় জগতের প্রতিটি কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। বুদ্ধ বলেছেন কেবল কৃচ্ছ্র সাধন করে অথবা ভোগ বিলাস করে মুক্তি আসে না। মুক্তি আসে মধ্যপথ অবলম্বন করে। বুদ্ধ আরো উপলব্ধি করেছেন (১) জীবন দুঃখময়, (২) এ দুঃখের কারণ আছে : দুঃখের কারণ হলো অজ্ঞতা। (৩) এ দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাওয়া যায়, অজ্ঞতা দূর হলেই দুঃখ থেকে

মানুষের মুক্তি ঘটে। (৪) দুঃখ মুক্তির উপায় আছে। এগুলোকেই বৌদ্ধ ধর্মে ৪টি আর্য্য সত্য বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন দুঃখ মুক্তির উপায় হল ৮টি, সেই ৮টি উপায়কে বুদ্ধ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলেছেন। এই ৮টি উপায় অথবা মার্গকে মধ্যম পথও বলা হয়ে থাকে। ৮টি মার্গ হলো (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক চেষ্টা, (৭) সম্যক স্মৃতি এবং (৮) সম্যক সমাধি। বৌদ্ধ দর্শনে এগুলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। বুদ্ধ বলে গেছেন কেবল ভোগ বা কৃচ্ছ্রতা দ্বারা নয়, এ দুয়ের মাঝপথ বা পন্থা অবলম্বন করে মুক্তি সম্ভব। বুদ্ধ নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রচলিত ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস নেই, মিথ্যে কোনো আশাবাদ নেই। আছে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন। তিনি মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে যাগযজ্ঞ ও প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে পশুবলি বা নরবলি প্রথা বাদ দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও অসমতা এবং জগতের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হতে হবে বলেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ বা নির্বাণ প্রাপ্তিকে কি বুঝাতে চেয়েছেন? ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্তি বলতে বুঝাতে চেয়েছেন দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি। তার সব কামনা বাসনা তিরোহিত হয়েছে, তার আর পুনর্জন্মও হবে না। কারণ তার ভব তৃষ্ণা মিটে গেছে। বুদ্ধের নির্দেশিত ৮টি পথ বা মার্গের প্রথমটি হল সম্যক দৃষ্টি (Right view)। যার অর্থ হল ৪টি আর্য্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। বুদ্ধ অজ্ঞতাকে বা অবিদ্যাকে দুঃখের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এ অজ্ঞতার কারণে মানুষ শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস করে, জগৎকে স্থায়ী মনে করে বস্তুর প্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হয়। সব কিছুই অনিত্য এবং জীবন দুঃখময়– জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে এ ধরনের জ্ঞান হলে একমাত্র দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, মহামতি বুদ্ধ বলেছেন মানুষের সম্যক সংকল্প থাকতে হবে। এর অর্থ হল এ জগতের সব জিনিসের প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ, ভোগ বিলাস, হিংসা, রাগদ্বেষ, কামনা বাসনা ও মোহ প্রভৃতি বর্জন করার এবং অন্যের প্রতি কুমনোভাব বা ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থেকে সব মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। এটিই হলো সম্যক সংকল্প ইংরেজিতে (Right determination)। এরপর হলো সম্যক বাক্য বা বাকসংযম (Right Speech)। শুধু সৎ সংকল্প থাকলে চলবে না, মুক্তিকামী অর্থাৎ একজন খাঁটি বৌদ্ধ হতে হলে তাকে মিথ্যে কথা, কটু কথা, অশ্লীল বা অমার্জিত ভাষা, পরনিন্দা প্রভৃতি বর্জন করে মিষ্ট এবং সত্য ভাষী হতে হবে। শুধু সংযত বাক্য বললে বা মিষ্টভাষী হলে চলবে না, তার সঙ্গে প্রয়োজন সম্যক কর্ম বা আচরণ (Right Conduct)। প্রাণী হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, অবৈধ কামক্রিয়া, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দানশীল,

পরোপকারী ও সহনশীল হয়ে নিষ্কামভাবে মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর হলো সম্যক জীবিকা (Right Livelihood). অর্থাৎ সৎ উপায়ে জীবনযাপন করা। মুক্তিকামী মানুষকে তার জীবন ধারণের জন্য যে কোনো রকমের অসৎ উপায়কে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। নির্বাণ লাভের পথে মুক্তিকামী ব্যক্তির পদস্খলন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সম্যক চেষ্টা বা Right effort। মনকে কুচিন্তা থেকে মুক্ত রেখে সব সময় সৎ চিন্তা করতে হবে। এবং অর্জিত মহৎ গুণসমূহকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। এরপর হলো সম্যক স্মৃতি (Right mind fulness) মুক্তিকামী মানুষকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে তার মন যেন কখনো পথভ্রষ্ট না হয়। তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জগতের সব কিছুই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। এতে জীবন ও জগতের প্রতি তার কোনো আসক্তি থাকবে না এবং আসক্তি না থাকলে বন্ধন ও দুঃখ থেকে তার মুক্তি লাভ সম্ভব হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম ও শেষ পথ হলো সম্যক সমাধি (Right concentration)। এটি হলো ধ্যানের স্তর। এ স্তরে মুক্তিকামী মানুষ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে নিসন্দিগ্ধ হন এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে তখন ধ্যানে মগ্ন হন। তার ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং এক স্তরে তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হন। সব দুঃখ থেকে তিনি তখন মুক্ত অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত। নির্বাণ মানে দ্বেষ, লোভমোহ, কামনা-বাসনা রহিত অনাবিল শান্তির একটি অবস্থা। বুদ্ধ স্বয়ং নির্বাণ লাভের পর দীর্ঘ ৪৫ বছর বেঁচে থেকে তার ধর্ম মানব কল্যাণের জন্য প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধ আরো বলেছেন জগতে আরো অনেক সত্য আছে, তিনি কেবল দু-একটির সন্ধান পেয়েছেন।

বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্যের আলাদা বৈশিষ্ট আছে, নতুনত্ব আছে। অন্য ধর্মগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বা সংযুক্ত। কিন্তু বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্যের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো ধারণা বা ভূমিকা নেই, দেবদেবীরও কোনো স্থান নেই। নরকের ভয় বা স্বর্গের কোনো প্রলোভন নেই; নেই কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ। তার আবিষ্কৃত সত্য বিশ্বাসের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে যুক্তির মাধ্যমে। তিনি তার আবিষ্কৃত সত্য প্রথম প্রচার করলেন তার প্রাক্তন পাঁচজন শিষ্যদের নিকট বেনারস এর কাছে সারানাথে। তিনি তাদের কাছে তার আবিষ্কৃত সত্যের ব্যাখ্যা দান করলেন। এটাই তার প্রথম ধর্মীয় বাণী। এরপর তিনি সমগ্র মানুষের মঙ্গলের জন্য তার ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ও বিজ্ঞান

পাশ্চাত্যে যখন বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয় সেই সপ্তদশ শতকে, তখন থেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের শুরু হয়। খ্রিষ্টান যাজকরা বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে তীব্র বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থি। গ্যালিলিওকে তার বৈজ্ঞানিক মত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে ধর্মীয় বিচারালয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান।

'পৃথিবী স্থির নয়, বরং সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে' কোপারনিকাসের এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন শুরু হয়, তা পরবর্তীতে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে শুধু যে চিরন্তন ধর্মীয় বিশ্বাসকে নস্যাৎ করেছে তা নয়, এ বিশ্ব জগতের ভূকেন্দ্রিক (Geo centre) ধারণা সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ডারউইন এর বিবর্তনবাদ (Evolution), ধর্ম বিশ্বাসীদের বিশ্বজগতের সৃষ্টি বিষয়ক বিশেষ সৃষ্টিবাদ, মানুষের স্বর্গ থেকে মর্তে নিক্ষেপণ ইত্যাদি বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত হানে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এই যে দ্বন্দ্ব তা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই– ধর্ম অন্ধ বিশ্বাস এর উপর ন্যস্ত, যেখানে যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হলো এর ভিত্তি। এ দিকে বিচার করলে বৌদ্ধ ধর্মকে ধর্ম বলা যাবে না। বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো বৈজ্ঞানিক। এখানে অলৌকিক ধারণার, নির্বিচারবাদ বা অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বৌদ্ধ ধর্ম কোনো ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বাণী (Revelation), কোনো প্রাধিকার (Authority) বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এর ভিত্তি হলো নীতি (Principles) বা মতবাদ (Doctrines)। এই নীতি বা মতবাদগুলোকে আবার কেউ যেন অন্ধভাবে গ্রহণ বা বিশ্বাস না করে সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মকে জানতে হবে বা বুঝতে হবে বিশ্বাসের মাধ্যমে

নয়, একমাত্র বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। বুদ্ধ তার অনুসারীরা যেন তার কথাগুলো নির্বিচারে গ্রহণ না করে, সে বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। 'অঙ্গু'ত্তর নিকায়' তিনি যা বলেছেন তা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

(১) শুধু জনশ্রুতির (hearsay) ভিত্তিতে কোনো কিছুকে বিশ্বাস করো না।

(২) কোনো একটি ঐতিহ্যকে (tradition) শুধু প্রাচীন হবার কারণে এবং বংশপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে বলে বিশ্বাস করো না।

(৩) লোকে খুব বেশি বলাবলি করে বলেই কোনো কিছুকে বিশ্বাস করো না।

(৪) শুধু প্রাচীন কোনো বিজ্ঞ লোকের লিখিত প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে বলেই কোনো কিছুকে বিশ্বাস করো না।

(৫) যাকে স্বীকার করে নিতে হবে অথবা যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে কোনো প্রাচীন দৃষ্টান্ত তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, সে ধরনের কোনো জিনিসকে কখনোও বিশ্বাস করবে না।

(৬) শুধু তোমার কোনো গুরুর অথবা পুরোহিতের প্রত্যাদেশ বলেই কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করবে না।

(৭) তুমি কেবল সেটিকেই সত্য বলে এবং তোমার জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে যা নিখুঁতভাবে অনুসন্ধানের পর তোমার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে। এবং যা তোমার নিজের এবং প্রাণীর মঙ্গলের জন্য সহায়ক হবে।

উপরে উল্লিখিত কথাগুলো একজন ধর্ম প্রচারকের সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে যে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক।

বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের মঙ্গল বা মুক্তির জন্য ঈশ্বর বা অতি জাগতিক শক্তির কোনো ভূমিকা নেই। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে স্বাবলম্বনের ধর্ম। বুদ্ধের মতে মানুষের মুক্তির দাতা মানুষ নিজেই। প্রতিটি মানুষকে নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষই মানুষের ভাগ্য বিধাতা বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় শিক্ষা। কোনো অলৌকিক শক্তি বা অদৃষ্টের ওপর ভরসা করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা বৌদ্ধ ধর্মের মতে একেবারে নিষ্ফল এবং অর্থহীন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ড. রাধা কৃষ্ণন বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন 'If Buddhism appealed to the modern mind it was because it was scientific, empirical and not based on any dogma. This is Buddhism, there is no blind faith and groundless devotion.

বিপ্লবী বুদ্ধ

গৌতম বুদ্ধ হলেন সেই সময়ের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী এবং সমাজ সংস্কারক। তার বিপ্লবী জীবন শুরু হয় তার গৃহ ত্যাগের মাধ্যমে। একজন রাজপুত্রের তার সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র এবং ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণের মোহ ত্যাগ করা কেবল সেকালে নয়, সর্বকালের জন্য অচিন্তনীয় ব্যাপার। রাজপ্রাসাদের সকল আরাম আয়েশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ এবং ভিক্ষুকের বেশে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করা একজন বিদ্রোহী বিপ্লবী ছাড়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি ৬ বছর কঠোরভাবে কৃচ্ছ সাধন করেন কিন্তু সত্যের সন্ধান পাননি। এরপর তিনি কৃচ্ছ্র সাধন ত্যাগ করেন এবং মধ্যপথ অবলম্বন করে ধ্যান সাধনা শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত বোধি জ্ঞান লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধ বিশ্বের একমাত্র মানবতাবাদী ধর্ম প্রচারক যিনি সর্ব প্রথম অস্ত্র ছাড়াই কেবল অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের সূচনা করেছেন। বুদ্ধের বিপ্লবের উদ্দেশ্য শুধু সমাজের পরিবেশকে সুন্দর সুস্থ করে তোলা নয়, মানুষের মনের ও চরিত্রেরও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধের বিপ্লব শুরু হয় সেকালের সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে। তখন সমাজ আর্য্য, অনার্য্য, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, উচ্চ নিচ– এক কথায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল। বুদ্ধ এ ভেদাভেদ দূর করেন। তিনি জন্মের দ্বারা মানুষের ভেদাভেদ অস্বীকার করলেন এবং জন্মের কারণে, বংশের কারণে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অস্বীকার করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব জন্মের ওপর নির্ভর করে না। একমাত্র চরিত্র ও গুণের দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। কাজেই বুদ্ধের মতে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে যে কেউই ব্রাহ্মণ হতে পারে। কেননা চরিত্রই মানুষকে মানুষ বা অমানুষ করে গড়ে তুলে। তাই মানুষের আসল পরিচয় তার জন্ম নয়, চরিত্র।

তখনকার দিনে সমাজে নিম্নশ্রেণীর বিশেষ করে শূদ্র ও মেয়েদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোনো অধিকার ছিল না। বুদ্ধই সর্বপ্রথম তাদের এ অধিকারটুকু দেন। সমাজের অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর অনেককেই বুদ্ধ বিনাদ্বিধায়

নিজের সংঘে স্থান দিয়েছিলেন।

তখন সংস্কৃত ছিল আভিজাত্যের ভাষা। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের ভাষা। এ ভাষাতেই ধর্মীয় কাজকর্ম সমাধান করা হতো। সমাজের সাধারণ মানুষের তা ছিল বোধগম্যের বাইরে। ভগবান বুদ্ধ তখন সাধারণ মানুষের ভাষা, আমজনতার ভাষা– পালি ভাষায় তিনি তার ধর্ম প্রচার করেন। এভাবে বুদ্ধই প্রথম সাধারণ মানুষের ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দেন। কেবল তাই নয়, বুদ্ধ তার সংঘের এবং বৌদ্ধ বিহারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ভোটের মাধ্যমে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি প্রচলন করেন।

বুদ্ধের বাণী হচ্ছে সার্বজনীন প্রেম করুণার বাণী, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী। তিনি সর্বজীব ও মানুষের জন্য মুক্তি ও সুখ কামনা করেছেন। তাই আজকের হিংসায় উন্মত্ত ও দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে বুদ্ধের বাণী এক বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

বুদ্ধ যে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী তার আরো একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃত্যুর আগে তিনি তার পরিবর্তে কাহাকেও সংঘ পরিচালনার ভার দিয়ে যাননি, যদিও ইচ্ছা করলে তার প্রধান শিষ্য আনন্দ বা অন্য যে কোন একজনকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাই তার মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ ধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। রাজপুত্র হয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি বুদ্ধের ছিল অসাধারণ দয়া ও ভালবাসা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন এবং রক্তপাতহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম এবং দর্শন

যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৫৬৩ বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়। অর্থাৎ ২৫০০ বছরের অধিককাল পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হলেও বৌদ্ধ ধর্ম একটি আধুনিক ধর্ম, বৈজ্ঞানিক ধর্ম এবং যুক্তির ধর্ম। তবে বৌদ্ধ ধর্মকে বৌদ্ধ দর্শনও বলা যায়। গৌতম বুদ্ধের সুমহান উপদেশ, বাণী এবং চিন্তাধারাই বৌদ্ধ ধর্মের উৎস এবং ভিত্তি। অলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও রহস্যবাদ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম মুক্ত। হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি। বুদ্ধ যীশু খ্রিষ্টের মতো ঈশ্বরের সন্তান নন, শ্রীকৃষ্ণের মতো ভগবান নন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মতো পয়গম্বর নন। রাজপুত্র হলেও আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ, যিনি সাধনা বলে বুদ্ধত্ব লাভ করে ইতিহাসে অমর হয়েছেন। অন্যান্য ধর্ম প্রচারকগণ যেখানে নিজেদের বাণীগুলোকেই একমাত্র পরম সত্য বলে দাবি করেন এবং এগুলোকে অন্ধভাবে ও নির্বিচারে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান, বুদ্ধ সেখানে তার অনুগামীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি যা বলছি, তা তোমরা নির্বিচারে মেনে নিও না। আমার কথাকে তোমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখ।' এতো বড় কথা যুক্তিবাদী ছাড়া কেহ বলতে পারে? হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। আর বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি। খ্রিষ্টান এবং ইসলাম যেখানে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ ঈশ্বরের মাধ্যমে সব জিনিসের ব্যাখ্যা দিয়েছে, বৌদ্ধ ধর্ম সেখানে প্রাধান্য দিয়েছে বুদ্ধিকে, যুক্তিকে এবং এ জীবন ও জগতের সব জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

এ জীবন দুঃখময়, এ দুঃখের কারণ আছে। এ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর জন্য উপায় আছে। এ চারটি আর্য্য সত্যকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দর্শন বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে। জীবন যে দুঃখময়, সেটাতো অস্বীকার করবার উপায় নেই। মৃত্যু আমাদের জীবনে অপরিহার্য। জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, মনোবাঞ্ছনাপূর্ণ না হওয়া দুঃখ– এ ধরনের হাজারো রকমের দুঃখে আমরা জর্জরিত।

বুদ্ধের মতে জগতের প্রত্যেকটি জিনিস কার্যকারণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন বস্তুই স্বয়ং উৎপন্ন হয় না– একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনা থেকে সঞ্জাত। সব কিছুরই উৎপত্তি হয় অন্য একটি বা একাধিক ঘটনা থেকে। বৌদ্ধ দর্শনের এ তত্ত্বকে বলা হয় 'প্রতিত্য সমুৎপাদ।' বুদ্ধ জীবনকে যেমন দুঃখময় বলে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও দেখিয়েছেন। এ দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ই হল তার বিখ্যাত অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বৌদ্ধ ধর্ম তাই দুঃখবাদী নয়, আশাবাদী। বুদ্ধের মতে জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল, সারা বিশ্বে চলেছে বস্তুর বিরামহীন পরিবর্তন ও রূপান্তর। মানুষের জীবন হচ্ছে এক অবিরাম প্রবাহ– আবির্ভাব ও তিরোভাবের একটানা ছন্দ– জন্ম ও মৃত্যুর এক অন্তহীন স্রোত।

খ্রিষ্টান ধর্মে যীশুই একমাত্র মুক্তির উপায়। যীশু বলেন, সবকিছুই আমার কাছ থেকে নাও; নিজেদের ওপর তোমরা নির্ভর করো না, আমিই একমাত্র তোমাদের রক্ষক এবং মুক্তিদাতা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চঃ দুস্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে অর্থাৎ সাধুদের মুক্তির জন্য এবং দুষ্টদের শাস্তি প্রদানের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই'। ইসলাম ধর্মে স্বয়ং আল্লাহই মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। অন্যায় কাজের জন্য মানুষকেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অবশ্য শেষ বিচারের দিনে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তার উম্মতদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার কথা আছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে মুক্তির জন্য ঈশ্বর আল্লাহ বা অতি জাগতিক শক্তির কোনো ভূমিকা নেই। বুদ্ধের মতে মানুষের মুক্তির দাতা মানুষ নিজেই। প্রত্যেক মানুষকে নিজেই নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোনো অলৌকিক শক্তি বা অদৃষ্টের ওপর ভরসা করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা নিষ্ফল এবং অর্থহীন। প্রত্যেকেই নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। এটা আজকের মানুষের জন্য এক বড় শিক্ষা এবং এটা আধুনিক মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি। তাই অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন বৌদ্ধ ধর্ম আসলে বৌদ্ধ দর্শন। এবং বুদ্ধের সুমহান উপদেশ, বাণী এবং চিন্তাধারাই বৌদ্ধ ধর্মের উৎস ও ভিত্তি। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা।

বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিকতা

নৈতিকতা বৌদ্ধ ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেকেই মনে করেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলে নীতিবান হওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের কোনোরকম ধারণা ছাড়াই যে নীতিবান হওয়া যায়, তার প্রমাণ বৌদ্ধ ধর্ম। গৌতম বুদ্ধই প্রথম প্রচার করেন যে, নৈতিকতা ধর্ম থেকে আলাদা। তার প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি। ঈশ্বর আছে সেটাও বলা হয়নি, ঈশ্বর নেই সেটাও বলা হয়নি। বুদ্ধ বলেছেন, দেবদেবীর পূজা অর্থহীন। বৌদ্ধ ধর্মে নীতিবান হওয়া, শীলবান হওয়া হল নিজের প্রয়োজনে, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা ঈশ্বরকে ভয় পেয়ে নয়।

বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিকতার ২টি দিক আছে। একটি হলো নঞর্থক (Negative), অপরটি হলো সদর্থক (Positive)। অন্য কথায় একজন বৌদ্ধকে কতকগুলো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কতক কাজ সম্পাদন করতে হবে বা সম্পাদন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। যেমন বুদ্ধ গৃহী বৌদ্ধদের নিম্নোক্ত ৫টি শীল বা নিয়ম পালনের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

(১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা;
(২) অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
(৩) ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা;
(৪) মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকা;
(৫) মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা

উল্লিখিত ৫টি শীলকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ জ্ঞাপক। প্রথম শীলটির কথা ধরা যাক। প্রথম শীলে কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে সেখানে কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মানুষের বা প্রাণীর ক্ষতি সাধন না করার কথাও বুঝানো হয়েছে। একজন মানুষ নিজ হস্তে বা কারোর মাধ্যমে কোনো

প্রাণীকে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা বা শারীরিক বা মানসিকভাবে অনিষ্ট সাধন করতে পারে। সে যে পদ্ধতিতে হউক না কেন, কাহাকেও হত্যা করা, হত্যার চেষ্টা করা, বা ক্ষতি সাধন করা, কষ্ট দেওয়া, নিপীড়ন করা এমনকি হত্যা করার বা ক্ষতি সাধন করার ইচ্ছা বা কামনা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

আর দ্বিতীয় শীলটি হলো অপ্রদত্ত জিনিস বা বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ চুরি করা থেকে বিরত থাকা। এখানে কেবল চুরি করা নয়, লোভ, লালসা, মোহ, আকর্ষণ প্রভৃতিও বিনষ্ট করতে হবে।

তৃতীয় শীলটিতে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বিয়ে করা বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনযাপন করতে নিষেধ করা হয়নি। যেটা নিষেধ করা হয়েছে সেটা হলো বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়কে সৎভাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

চতুর্থ শীলটিতে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মিথ্যা কথা এখানে অপ্রিয় কথা, অশালীন কথা, কটু কথা, সত্য গোপন, পরদূষণ ইত্যাদি বুঝায়।

পঞ্চম শীলটি হলো মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা। মাদক দ্রব্য সেবন মানুষের মনকে কলুষিত করে। তাকে মোহাচ্ছন্ন করে, তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। একজন মাদকসেবী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যে কোনো ধরনের অপরাধ করতে পারে। তাই গৌতম বুদ্ধ মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এখানে কেবল নৈতিকতার নঞর্থক দিকটি আলোচনা করা হয়েছে। নৈতিকতার অপর দিক হলো সদর্থক (Positive)। অর্থাৎ বৌদ্ধদের করণীয় কাজ কি? কি সব কাজ তাদের সম্পাদন করতে হবে এবং করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বত্র নানা ভাল কাজের উল্লেখ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে 'দান'কে। সহজ অর্থে এই 'দান' বলতে বুঝায় দেয়া– কোনো ব্যক্তিকে; দরিদ্রকে, দুঃখীকে, সাহায্য প্রার্থীকে। ভিখারিকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে টাকা-পয়সা, অন্ন বস্ত্র বা অন্য কোনো জিনিস প্রদান করা। এ অর্থে ভিক্ষু সংঘকে আহার্য প্রদান, চীবর দান, বা অন্য কিছু প্রদান করাও বুঝায়। গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন ভিক্ষা দান করে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং লাভবান হয়। তিনি আরো বলেছেন দানের দ্বারা নয়, নিম্নোক্ত কারণে মানুষের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে।

(১) শাসক
(২) চুরি
(৩) আগুন

(৪) বন্যা
(৫) মওজুদ জিনিস ঠিকমতো সংরক্ষণ না করা
(৬) পথভ্রস্ট হওয়া ও কাজ না করা
(৭) পরিবারের মধ্যে গোলমাল এবং
(৮) অস্থায়িত্ব

বৌদ্ধ ধর্মে কোনো জিনিস প্রদান করাটাই বড় নয়, আসল হলো প্রদান করার ইচ্ছা। দাতার সদিচ্ছা ভিন্ন যেকোনো ধরনের দান অর্থহীন। এই ইচ্ছা শুধু দান করার ইচ্ছা নয়, প্রকৃতপক্ষে সর্বজীবে দয়া এবং করুণা কামনার অকৃত্রিম ইচ্ছা। সর্বজীবে এই মঙ্গল কামনার নামই হলো মেত্তা। দান হলো এই মেত্তারই বহিঃপ্রকাশ। মেত্তা বা মৈত্রী ভাবনার অনুসারীকে এমন এক মানসিক অবস্থায় অবতীর্ণ হতে হবে যেখানে তার নিজের ও অন্যের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালমন্দ, সুবিধে-অসুবিধে, প্রেম-ভালবাসা হবে এক ও অভিন্ন। অন্য কথায় মা সন্তানকে যে ভালবাসেন, একজন বৌদ্ধকে ঠিক একইভাবে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত, শত্রু-মিত্র এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখাতে হবে। শুধু সকলের প্রতি প্রেম, ভালবাসা বা করুণা প্রদর্শনই নয়, সকলের মঙ্গল বা সুখ কামনা ছাড়া নীতিবান বা শীলবান হওয়া সম্ভব নয়। কারোর প্রতি হিংসা নয়, সকলের প্রতি ভালবাসা ও করুণা এবং সকলের সুখ কামনা করা একজন প্রকৃত বৌদ্ধের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। কারণ গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন 'সবেব সত্তা সুখীতা হন্তু' অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

বৌদ্ধ ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাস অহিংসার ইতিহাস, সাম্য ও মৈত্রীর ইতিহাস। বৌদ্ধরা কখনও ধর্মের নামে কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি বা কোনো রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। জোর পূর্বক ধর্মান্তর করা, বিধর্মীদের বিচারের জন্য আদালত গঠন করা, অবৌদ্ধদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার নিপীড়ন করা অথবা অবৌদ্ধদের ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা বা লুট করার কোনো দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে নেই। একজন বিধর্মীকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করতে পারলে নিজের পূণ্য হবে, ঈশ্বর খুশি হবেন এরকম ধর্ম বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্মে নেই। একজন বৌদ্ধ অন্য ধর্মে চলে গেলে বা গ্রহণ করলে তাকে স্বধর্মত্যাগী বলে সাজা দেয়া বা তার বিচার করা ইত্যাদি আচরণ বৌদ্ধ ধর্মে নেই।

খ্রিষ্টান ধর্মে যেমন আছে ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ, পবিত্র ইসলামে আছে জেহাদ অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ; বৌদ্ধ ধর্মে এরকম কোনো মতবাদ বা বিশ্বাস নেই। উল্লেখ্য, খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের নিকট হতে তাদের পবিত্রস্থান জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য কয়েকশত বছর ধরে বার বার অভিযান চালিয়েছিল। এগুলোকে

Crusade বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। আর মুসলমানরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলে গাজী হয়, আর তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করলে শহীদ অর্থাৎ জান্নাতবাসী হয়– এরকম ধারণায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে এরকম কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই। তাছাড়া মুসলমানরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জেহাদ বলে এবং জেহাদে মারা গেলে তারা শহীদ হয় বলে বিশ্বাস করে, বৌদ্ধ ধর্মে এরকম বিশ্বাসও নেই।

এ পৃথিবীতে ধর্মের নামে কত যুদ্ধ ও নির্মম হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে বিধর্মীদের প্রতি কত উৎপীড়ন-নিপীড়ন যে করা হয়েছে, এখনও করা হচ্ছে সে করুণ ইতিহাস আমাদের অনেকের জানা আছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস একটি ব্যতিক্রম। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি যে শান্তি, প্রেম, করুণা ও সহনশীলতার তার প্রমাণ এর ইতিহাস। বৌদ্ধধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাস হলো অহিংসার ইতিহাস, সাম্য মৈত্রীর ইতিহাস। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বৌদ্ধ ধর্মের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক। প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করা তা সে যে ধর্মের হউক, একজন বৌদ্ধের জন্য একটি অনিবার্য পালনীয় শর্ত। একজন প্রকৃত বৌদ্ধের কাছে একজন বন্ধু বা আত্মীয়ের জীবন যেমন মূল্যবান, ঠিক তেমনি মূল্যবান শত্রুর জীবনও। বুদ্ধ বলেছেন, হিংসার দ্বারা হিংসা প্রশমিত হয় না, একমাত্র প্রেমের দ্বারা তা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে এ প্রেম বা মৈত্রীর অর্থ এত ব্যাপক যে, এখানে প্রেম বলতে শুধু মানব প্রেমকে বুঝায় না, সর্বজীবে দয়া ও করুণাকেও বুঝায়। বুদ্ধ বলেছেন, হিংসা দ্বারা হিংসা প্রশমিত হয় না, একমাত্র প্রেমের দ্বারা তা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে প্রেম বা মৈত্রীর অর্থ এত ব্যাপক যে এখানে প্রেম বলতে শুধু মানব প্রেমকে বুঝায় না, সর্বজীবে দয়াও বুঝায়। সম্রাট অশোক প্রচার করেছিলেন পরধর্ম শ্রদ্ধা করলে নিজের ধর্মই মহৎ হয়। আদর্শ বৌদ্ধ সম্রাট অশোক দুই হাজার বছরের অধিক আগে এসব কথাই প্রচার করেছিলেন। এবং তার প্রজাদের অনুসরণ করতে বলেছিলেন। এ বিষয়ে তার কয়েকটি শিলালিপির বর্ণনা দেয়া হল। উল্লেখ্য সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিলালিপিগুলো স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

ASOKA'S DHAMMA

Rock Edict, No. 1.

1. No animal may be slaughtered for sacrifice.
2. The tribal feasts in high places are not to be celebrated.

Rock Edict, No. 3.

3. Docility to parents is good.

4. Liberality to friends, acquaintances and relatives and to brahmins and recluses is good.

5. Not to injure living beings is good.

6. Economy in expenditure, and avoiding disputes, is good.

Rock Edict, No. 7.

7. Self-mastery

8. Purity of heart

9. Gratitude

10. Fidelity

are always possible and excellent even for the man who is too poor be able to give largely.

Rock Edict, Nos. 9 and 11.

11. People perform rites or ceremonies for luck on occasion of sickness, weddings, childbirth, or on starting on a journey – corrupt and worthless ceremonies. Now there is a lucky ceremony that may be performed, – not worthless like those, but full of fruit, – the lucky ceremony of the Dhamma. And therein is included right conduct towards slaves and servants, honour towards teachers, self-restraint towards living things, liberality to Brahmins and recluses. These things, and others such as these, are the lucky ceremony according to the Dhamma. Therefore should one – whether father or son or brother or master – interfere and say: "So is right. Thus should the ceremony be done to lasting profit. People say liberality is good. But no gift, no aid, is so good as giving to others the gift of the Dhamma, as aiding others to gain the Dhamma."

Rock Edict, Nos. 12.

12. Toteration. Honour should be paid to all, laymen and recluses alike, belonging to other sects. No one should disparage other sects to exalt his own. Self-restraint in words is the right thing. And let a man seek rather after the growth in his own sect of the essence of the matter.

Pillar Edict, Nos. 2.

13.The Dhamma is good. But what is the Dhamma? The having but little, in one's own mind, of the Intoxications[1]; doing many benefits to others; compassion; liberality; truth; purity.

Pillar Edict, Nos. 3.

14. Man sees but his good deeds, saying: "This good act have I done." Man sees not at all his evil deeds, saying: "That bad act have I done, that act is corruption". Such self-examination is hard. Yet must a man watch over himself, saying: "Such and such acts lead to corruption, such as brutality, cruelty, anger and pride. I will zealously see to it that I slander not out of envy. That will be to my advantage in this world, to my advantage, verily, in the world to come."

উল্লেখ্য, শিলালিপিগুলোতে ভগবান বুদ্ধ বা তাঁর ধর্মের কথা বলা হয়নি। সম্রাট অশোক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তার সকল প্রজাদের edictগুলো অনুসরণ করে চলতে বলেছেন। (Edictগুলো লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রফেসর ড. টি. ডবলিউ, রিস ডেভিডস এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Buddhist India' হতে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় পৃষ্ঠা-২৯৪-২৯৭)।

হীনযান ও মহাযান

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৩ সালে বুদ্ধের মহাপরি নির্বাণের পর তার শিক্ষা ও বাণীর আসল রূপ নিয়ে তার শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। বুদ্ধের সময়কালীন প্রাচীন ভারতে লেখার কোনো প্রচলন ছিল না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদও তখন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। শিষ্যরা গুরুদের কাছ থেকে শুনে শুনে তা মনে রাখতো। এজন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ তাই তখন লিপিবদ্ধ করে রাখার কোনো উপায় ছিল না। তথাগত বুদ্ধের কাছে তার শিষ্যরা যা শুনতেন, তাই তারা মনে রাখতেন এবং সাধারণ জনগণের কাছে প্রচার করতেন। তার মৃত্যুর দুই মাস পর তার প্রচারিত ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে যখন কিছুটা মতভেদ দেখা দেয় তা নিরসনের জন্য মগধের রাজধানী রাজগৃহের কাছে সপ্তর্পণ গুহায় ৫০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাবেশে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি বা কাউন্সিল নামে পরিচিত। আনন্দ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের নিত্য সহচর। তিনি জানতেন কোথায় এবং কখন বুদ্ধ কি শিক্ষা বা উপদেশ দিয়েছিলেন। আর অন্যতম শিষ্য উপালি জানতেন বুদ্ধের নির্দেশিত বিনয় বা ভিক্ষু সংঘের জন্য পালনীয় রীতিনীতি। মহাসঙ্গীতিতে আনন্দ বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ আবৃত্তি করে শুনান তা পরে সূত্র পিটক হিসেবে পরিচিতি পায়। আর ভিক্ষু সংঘের জন্য বুদ্ধ যে নিয়ম-কানুন বলে দেন সেটা উপালি আবৃত্তি করে শুনান, সেটা হয় বিনয়পিটক। আনন্দ সূত্র পিটক এবং উপালি বিনয় পিটক আবৃত্তি করে শুনানোর পর বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ বুদ্ধের তত্ত্বকথা আবৃত্তি করে শুনান। সেটাই পরবর্তীতে অভিধর্ম পিটক নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে বুদ্ধের এই ৩ শিষ্যের আবৃত্তিই ত্রিপিটক নামে পরিচিতি পায়।

প্রথম মহাসঙ্গীতির পর আরো ৩টি মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম মহাসঙ্গীতির একশত বছর পর ২য় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের সময় তার পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় মহাসঙ্গীতি এবং খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে ৪র্থ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত

হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে ২য় মহাসঙ্গীতির বিশেষ একটি তাৎপর্য রয়েছে এ কারণে যে, এ সময় হীনযান ও মহাযান মতবাদে বৌদ্ধ ধর্মের দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। অর্থাৎ বিভক্তির সূত্রপাত ঘটে। তবে সম্রাট কণিষ্কের সময় (প্রথম শতাব্দীতে) অর্থাৎ চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্পূর্ণভাবে হীনযানী এবং মহাযানী হিসেবে বিভক্ত হয়ে যান। হীনযান বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ভারত, লাওস, বার্মা, থাইল্যান্ড, প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, আর মহাযানী ধর্ম প্রসার লাভ করে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভূটান, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে।

হীনযান ও মহাযানের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত : হীনযানের লক্ষ্য হলো অরহত্ব লাভ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সাধারণ জীবন বর্জন করে শ্রমণের জীবন গ্রহণ এবং বুদ্ধের ৪টি আর্য্যসত্য কঠোরভাবে পালন ও অনুশীলন। তজ্জন্য তাদের নিম্নোক্ত ১০টি শীল কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

(১) প্রাণী হত্যা না করা
(২) চুরি না করা অর্থাৎ অপ্রদত্ত কোনো দ্রব্য গ্রহণ না করা
(৩) মিথ্যা কথা না বলা
(৪) ব্রহ্মচর্য্য পালন করা
(৫) দুপুর ১২টার পর আহার না করা
(৬) মদপান না করা
(৭) নাচগানে অংশগ্রহণ না করা এবং নাচগান উপভোগ না করা
(৮) সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার না করা
(৯) আরামদায়ক বিছানায় শয়ন না করা
(১০) নিজ হাতে টাকা-পয়সা গ্রহণ না করা।

এছাড়া খাওয়ার পূর্বে মন্ত্রপাত করতে হয় এই বলে যে, রংবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আমি দানীয় খাদ্য গ্রহণ করছি এবং দায়ক-দায়িকারা আমার জীবন বাঁচিয়ে রাখছেন। ভুলবশত আমার যদি কায়িক, বাচনিক এবং মানসিকভাবে অপরাধ হয়ে থাকে, ধর্ম এবং সংঘ যেন আমাকে ক্ষমা করে থাকে। প্রত্যেকবার আহার গ্রহণের পূর্বে সেটা বলতে হয়। থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং শ্রমণরা সকাল ৬টার সময় একবার এবং বেলা ১১টার দিকে দিনের শেষ আহার গ্রহণ করেন। এরপর পরদিন সকাল পর্যন্ত আর কোনো আহার গ্রহণ করেন না।

অন্যদিকে মহাযানের লক্ষ্য হল বোধিসত্ত্বের নীতি অনুসরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ। হীনযানী ভিক্ষুদের কাছে তথাগত বুদ্ধ ছিলেন অতুলনীয়ভাবে অসাধারণ এবং

নির্বাণপ্রাপ্ত হয়ে তিনি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন তা অর্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব বলে তারা মনে করতেন। এ কারণে নির্বাণের চেয়ে নিম্নতর সেই অরহত্ব লাভের আশায় তারা সর্বোতভাবে সচেষ্ট থাকতেন। এমনকি এ অহরত্ব স্তর পৌঁছাও তাদের কাছে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বলে মনে হতো এবং ধর্মীয় নিয়মনীতি কঠোরভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করা সত্ত্বেও একজনের পূর্ণাঙ্গ জীবন এ লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয় বলে তারা মত পোষণ করতেন। মহাযানীরা অরহত্ব লাভের প্রশ্নটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, তাদের লক্ষ্য স্বয়ং সিদ্ধার্থ গৌতম নির্বাণ লাভ করে যেভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, ঠিক সে স্তরে উপনীত হওয়া। তাদের যুক্তি হলো সিদ্ধার্থই একমাত্র বুদ্ধ নন, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি নিজেই বোধিসত্ত্বের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন এবং বোধিসত্ত্ব রূপে বার বার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই মহাযানীদের মতে বোধিসত্ত্বের আদর্শ অনুসরণ করে, যে কোনো মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হতে পারেন। বোধিসত্ত্বের আদর্শকে সাধারণত ছয়টি মহৎ কাজ বা পারমিতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ৬টি পারমিতা হলো : দান, শীলপালন, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা, ধ্যান ও জ্ঞান।

বোধিসত্ত্বের ধারণাটি মহাযানের সৃষ্ট বা কল্পিত। বোধিসত্ত্ব হলেন করুণা ও প্রজ্ঞার আধার। যিনি বুদ্ধের পথ অনুসরণ করেন, সকল প্রাণীকে জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্য থেকে মুক্ত করার জন্য, তিনিই বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব হলেন মহা করুণাচিত্ত যিনি শুধু নিজের মুক্তি চান না, সকল প্রাণীর মুক্তিই তার কাম্য। শুধু সকলের মুক্তি কামনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, দুঃখাত প্রাণীর মুক্তির জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ হন এবং নিজে দুঃখ ভোগ করে অন্যদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেন।

অন্যদিকে হীনযানীরা গুরুত্ব দেন কর্মবাদের উপর। তাদের মতে মানুষের এ দুঃখ অবস্থার জন্য তাদের নিজ নিজ কর্মফলই দায়ী। তাই তারা চান এমন কর্ম সম্পাদন করতে যার ফলস্বরূপ তারা হবেন দুঃখ থেকে মুক্ত। এক কথায় তাদের লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ, প্রশান্তির এমন একটি স্তরে উপনীত হওয়া যেখানে পুনর্জন্মের শিকার হবেন না।

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা হল সর্বজীবে দয়া, করুণা, প্রেম, মৈত্রী বা ভালবাসা। বুদ্ধের আরো শিক্ষা হলো কেহ কারোর মুক্তির জন্য সাহায্য করতে পারে না। নিজের মুক্তির জন্য নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের জীবনকে দুঃখময় বলা হয়েছে; কিন্তু এ দুঃখটাই বড় নয়। আসল হলো এ দুঃখ অবস্থাকে অতিক্রমণ করা। এ দুঃখ অবস্থার জন্য দায়ী তার নিজের কর্মফল। তাই এমন কর্ম সম্পাদন করা দরকার যার ফলস্বরূপ মানুষ হবে দুঃখ থেকে মুক্ত, সর্বভব তৃষ্ণা অর্থাৎ সকল ধরনের কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। যেহেতু তার আর কোনো কামনা বাসনা নেই, কামনা বাসনা পূরণের জন্য তার পুনর্জন্মও হবে না।

বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতন

বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথমে মগধ রাজ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। মগধের রাজা বিম্বিসার তার ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম কেবল বর্তমান উত্তর ভারত, নেপাল এবং পূর্ব ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্য (এখন মগধ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। সম্রাট অশোকের সময় (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০-২৩৫) বৌদ্ধ ধর্ম কেবল সারা ভারতবর্ষে নয়, বার্মা শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড) কম্বোদিয়া, লাওস, ইত্যাদি, দক্ষিণে সিংহল (বর্তমানে শ্রীলংকা), পশ্চিমদিকে বর্তমান আফগানিস্তান, ইরানের এক অংশ, সিরিয়া, মিশর, এমনকি গ্রিস পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। সম্রাট অশোক এসব দেশে ধর্মপ্রচারক বা ধর্মদূত পাঠিয়েছিলেন। এরপর কুষান রাজত্বকালে (১৫-২৩০ খৃষ্টাব্দে) বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে। কুষান রাজত্বকালে বিশেষ করে সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমান মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম মালয় উপদ্বীপ, বর্তমান ইন্দোনেশিয়া এমনকি বর্তমান ফিলিপাইন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মধ্য এশিয়া হতে বৌদ্ধ ধর্ম আরল সাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম রাজ্য জয়ের মাধ্যমে অথবা যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বিস্তার লাভ করে নাই। সাধারণভাবে পরাজয়ের কারণে বিজিত রাজ্যগুলোর অধিবাসীরা রাজধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় অথবা অনুপ্রাণিত হয়, অন্যথায় দেশ ত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করে। যেমন আরবরা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার পর পারসিকরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, যারা গ্রহণ করেনি তারা ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী পারস্য হতে ভারতে আগত পারসিকদের একজন উত্তরপুরুষ। ভারতের এখন অন্যতম প্রধান শিল্পপতি পরিবার টাটারাও ধর্মে পারসিক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশাও ধর্মে একজন পারসিক। ভারতের সাবেক এটর্নি জেনারেল সোলি

সোরাব জি এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবার গডরেজরা ও পারসিক। আরো উল্লেখ্য, উনিশ শতাব্দীর শেষ পাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য দাদাভাই নওরোজী ও পারসিক ছিলেন। বর্তমানে ভারতের পারসিকদের সংখ্যা মাত্র ৭৫০০০। (পঁচাত্তর হাজার) ভারতে তারা সবচেয়ে উন্নত সম্প্রদায়, কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। এখানে আরো উল্লেখ্য, যীশু খ্রিষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যার পর তার একজন প্রধান শিষ্য সেন্ট টমাস ভারতের কেরালা রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও কেরালা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমেন চান্ডি, যিনি সিরিয়া হতে ভারতে আগত খ্রিষ্টানদের একজন বংশধর। একইভাবে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উৎখাত হয়ে একদল ইহুদী ও ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ এবং পরবর্তীতে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর লে. জেনারেল জেকব হলেন ইহুদী। তবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারতের অনেক ইহুদী ইসরাইল রাজ্যে হিজরত করে। ১-২০-২০০৭ তারিখে প্রকাশিত ইংল্যান্ডের দৈনিক 'The Guardian' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় যে, ভারতে এখনও ৫৫০০ ইহুদী রয়েছে। এখানে উল্লেখ, যে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কিছু মিজো ও নিজেদের ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া একটি গোত্রের (Lost tribe) বংশধর মনে করে। আরো উল্লেখ্য খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে ইহুদীদের রাজা ডেভিড জেরুজালেম জয় করেন এবং সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৯৬০ অব্দে রাজা ডেভিডের পুত্র সোলেমন জেরুসালেম-এ একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই হতে জেরুসালেম ইহুদীদের পবিত্রতম স্থান রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। কিন্তু ৫৮৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তারা জেরুসালেম হতে উৎখাত হয়ে যায়। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে তারা আবার জেরুসালেম ফেরত আসতে সক্ষম হয়। এর পরও তারা আরো কয়েকবার জেরুসালেম এবং তাদের রাজ্য জুডিয়া (বর্তমান সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন) হতে উৎখাত হয়, কিন্তু প্রত্যেকবার আবার ফেরত আসতে সক্ষম তয়। এসবের মধ্যে তাদের ২টি গোত্র বা tribes (সম্ভবত) হারিয়ে যায়। মিজোরামের কিছু মিজো নিজেদের সেই হারিয়ে যাওয়া একটি tribe এর বংশধর বলে মনে করে। তাই কয়েক বছর পূর্বে সেই মিজোদের একটি অংশ ইসরাইল রাষ্ট্রে চলে যায়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের বড়ুয়াগণের অনেকেই দাবি করেন যে, তারা ভারতের মগধ রাজ্য হতে তখন বৌদ্ধ রাষ্ট্র চট্টগ্রামে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম শত শত বছর ধরে আরাকান রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। মগধ হতে বড়ুয়ারা চট্টগ্রামে এসেছিল বলে এমনকি পাকিস্তান আমলেও মগ নামে পরিচিত ছিল বলে তারা এখনও দাবি করে থাকেন।

ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া এবং অন্য অনেক দেশ হতে বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদের

মূল কারণ হলো বৌদ্ধ ধর্ম নিজেই। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি হল অহিংসা। তাই যুদ্ধ বিগ্রহ বৌদ্ধ ধর্মের নীতির পরিপন্থি। তাই কালক্রমে অনেক বৌদ্ধ দেশ সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বিজিত হয়। অনেক সময় বিদেশীরা লুটপাট করে চলে যায় এবং অনেক সময় তারা বিজিত দেশে স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং নিজেদের ধর্ম স্থানীয়দের ওপরে চাপিয়ে দেয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এবং প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয়রা বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করে। অনেক সময় রাজা বা সম্রাটের দুর্বলতার কারণে সেনাপতিরাই সিংহাসন কেড়ে নেয়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সেনাপতি পুষ্য মিত্র সুঙ্গ মোর্য্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহ দ্রথকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসন দখল করেন এবং শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য পুষ্য মিত্র শুঙ্গ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলে বৌদ্ধ রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম হয়। কুষান সাম্রাজ্যের পতনের পর চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশের উত্থান হয়। গুপ্তরা হিন্দু ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরাগী ছিলেন না। এভাবে বৌদ্ধ রাষ্ট্রের পর হিন্দু রাষ্ট্র, এরপর আবার বৌদ্ধ রাষ্ট্রের উত্থান হয়। ভারত বর্ষ মুসলিমদের কাছে পদানত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বহুশত বছর চলতে থাকে। ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ রাজারা সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তবে বাংলার রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেছেন যে, হষবর্দ্ধন বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া পোড়াইয়া দিয়েছিলেন, বুদ্ধ মূর্তিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কুশিনারার এক বিহার হতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়েছিলেন। এভাবে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত বর্ষ হতে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এসবকে মিথ্যা বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের যুক্তি হলো শশাঙ্কর রাজধানী ছিল বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর সন্নিকটে কর্ণসুবর্ণে। অনুমান করা হয় যে, শশাঙ্ক ৬০০ হতে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। ওই সময়ই কর্ণসুকর্ণের উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ রক্তমৃত্তিকা মহা বিহারসহ আরো বেশ কিছু সংখ্যক বিহার ছিল। রাজধানীর কাছের বিহারগুলো ধ্বংস না করে বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া উচ্ছেদ করেছেন, কুশিনারার বিহার হতে ভিক্ষুদের তাড়াইয়া দিয়েছেন এসব অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া শশাঙ্কের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন থানেশ্বর ও কনৌজের তথা উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। রাজা শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন এমন কোনো তথ্য কোনো ঐতিহাসিক বলেননি। বরং ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তবে পরবর্তীতে তিনি আবার আবার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন শশাঙ্ক ছিলেন শৈব এবং

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংস করতে চাইলে তা তিনি প্রথমেই তার রাজধানীর কাছে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারকে ধ্বংস করে দিতেন। সেটাতো তিনি করেননি, স্বয়ং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সেই বিখ্যাত বিহার এবং অন্যান্য বিহারের কথা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। বাংলার সেনরাও ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। তবে সেনরা (১০৯৭-১২৬০) বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে ছিলেন এমন নজির নেই। কোনো ইতিহাসবিদ অথবা অন্য কেহ সে রকম লিখে যাননি।

উত্তর পশ্চিম ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির মূল কারণ হলো পারসিক, শক, হুন, আরব, তুর্কী, মোঙ্গল ইত্যাদিদের বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ। তবে শকরা প্রথম দিকে বৌদ্ধ মন্দিরগুলো লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করলেও পরবর্তীতে তারা নিজেরাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও প্রসার ঘটে। সেই সময় বৌদ্ধ বিহারগুলো বিশেষ করে মহাবিহারগুলো ধনরত্ন এবং মণি-মুক্তার ভাণ্ডার ছিল। সেইসব ধনরত্নের লোভে বিদেশীরা বারবার ভারত আক্রমণ করত, শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত এবং আহত হতেন। যারা বেঁচে যেতেন তারা ভিনদেশে পালিয়ে যেতেন। তারা গৃহী নয় বিধায় তাদের অন্যত্র পলায়ন করা বা চলে যাওয়া সহজ ছিল। ফলে মন্দিরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে সাধারণ বৌদ্ধরা দলে দলে বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করে। এভাবে উত্তর পশ্চিম ভারত হতে একসময় বৌদ্ধ ধর্ম উৎখাত হয়ে যায়। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর হতে বর্তমান বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে অনেক হিন্দু রাজ্যের উত্থান ঘটে এবং সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মেরও পুনরুত্থান ঘটে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক হিন্দু সাধক যেমন শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ মাধবাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখদের আবির্ভাব হয়। যার ফলে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ হয়। এছাড়া সে সময় অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং তারা সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে ফেলে। তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, বার্মা, কোরিয়া, ইত্যাদি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম টিকে থাকে, কারণ এসব দেশ কোনোদিন বিধর্মীরা দখল করতে পারেনি।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল না। তাই প্রাচীন ভারতের রাজা মহারাজারা তাদের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখে রাখতেন না। তাছাড়া যেগুলো ছিল সেগুলো বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তখন মহা বিহারগুলো কেবল ভিক্ষুদের সংঘারাম ছিল না, বর্তমান দিনের শিক্ষালয় অর্থাৎ বর্তমান দিনের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল। সেসব মহাবিহারগুলোতে কেবল ধর্মীয় বিষয়াদি পড়ানো হতো না, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা বিদ্যা এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রও পড়ানো হতো। বিদেশীরা সেসব মহাবিহারগুলো কেবল লুণ্ঠন করত না, সেগুলো পুড়িয়ে দিত, বুদ্ধ মুর্তিগুলো গুড়িয়ে দিত, মূল্যবান ধাতুর

হলে সেগুলো লুট করত। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি জানতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হয় বিদেশী পর্যটক, বিশেষ করে চীনা পর্যটকদের রচিত কাহিনী বা গ্রন্থগুলোর উপর। প্রাচীন ভারতে বেশ কয়েকজন চীনা পর্যটক এসেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ফাহিয়েন (৩৯৯-৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ) এবং হিউয়েন সাং (৬৩০-৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তারা দু'জনেই বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করতে, বৌদ্ধ ধর্মের উপর রচিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করতে, বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন নিয়মাবলী জানতে এবং তজ্জন্য সংস্কৃত পালা ভাষা শিখতে এবং সে সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট হতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরো জ্ঞান আহরণ করতে ভাতরবর্ষ সফর করতে আসেন। ফাহিয়েন চীনের সান্সি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সান্সি প্রদেশ হতে স্থল পথে গোবি মরুভূমি ও মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে পৌঁছেন। তিনি প্রায় ১৪ বছর (৩৯৯-৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতে ছিলেন। তিনি পাটালিপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনা) ৩ বছর অবস্থান করেন। তিনি মোট ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। ৬টি গ্রন্থ হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের চৈনিক অনুবাদ। আর ৭মটি হলো ভারত সম্পর্কে তার রচিত গ্রন্থ। ফাহিয়েন এর পর আসেন হিউয়েন সাং। তখন ভারত বর্ষে হর্ষবর্ধন রাজত্ব করতেন। হিউয়েন সাং ২০ বছর বয়সে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেন। চীনা ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের নানা ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি মূল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার জন্মস্থান হুনান প্রদেশ হতে বহু বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এবং নিদারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করে তুরফান এবং মধ্য এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশ অতিক্রম করে পুরুষপুর (বর্তমানে পেশোয়ার) পৌঁছেন। তারপর তিনি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীরের রাজা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি কাশ্মীরে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। কাশ্মীর হতে শিয়ালকোট এবং সেখান থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ পৌঁছেন। সেখানে তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপর হিউয়েন সাং প্রয়াগ, বারানসী, বুদ্ধগয়া, কপিলাবস্তু এবং অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করে পাটালিপুত্র (বর্তমান পাটনা) নগরে আগমন করেন। তিনি দুবার নালন্দায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে বর্তমান বাংলাদেশ ও আসামে যান। ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হিউয়েন সাং চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্গে নিয়ে যান বহু বুদ্ধমূর্তি এবং ৬৫৭টি পাণ্ডুলিপি। হিউয়েন সাং চীনে প্রত্যাবর্তন করে ভারতের উপরে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচনা হতে সে সময়কার অর্থাৎ ৭ম শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্ম ও নৈতিক অবস্থার উপর খুবই মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।

হিউয়েন সাং-এর বিবরণী হতে জানা যায় যে, তখনকার ভারত এবং

আফগানিস্তানে, বিভিন্ন বিহার, মহাবিহার এবং সংঘারামে অবস্থানকারী হীনযানী, মহাযানী এবং অন্য উপদলের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যা হল ২ লাখ ৩৫ হাজার। তাছাড়া আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে আরো কয়েক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। যার প্রকৃত সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেননি। ওই সময়কালের ভারতের এবং আফগানিস্তানের লোকসংখ্যা অনুমান করা হলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যা যে অত্যন্ত বিরাট তা অনায়াসেই বুঝা যায়। হিউয়েন সাং-এর গ্রন্থ হতে আরো জানা যায় যে, ওই সময় অনেক বৌদ্ধ বিহারে হীনযানী ও মহাযানী ভিক্ষুরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতেন এবং পড়াশোনা করতেন। তাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো। তখন ভারতের বিহার রাজ্যের নাম ছিল মগধ। হিউয়েন সাং হীন-যানী ভিক্ষুর সংখ্যা ১,১৫,০০০ (এক লক্ষ পনের হাজার) এবং মহাযানী ভিক্ষুর সংখ্যা ১,২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) বলে উল্লেখ করেছিলেন। হীনযানী সংঘারামের সংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন ২,০০০ এবং মহাযানী সংঘারামের সংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন ২৫০০। তাছাড়া শ্রীলংকায় ২০,০০০ ভিক্ষু ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। (পৃষ্ঠা- ৮৪ The World of Buddhism) হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজ্যে ৫ হাজার বিহার এবং অসংখ্য Monastic schools দেখেছিলেন। তখন নালনদা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী ছিলেন। সেসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই চীন, জাপান, কোরিয়া, বর্তমান শ্রীলংকা, বর্তমান মধ্য এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দূরান্তের দেশ হতে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য। ছাত্ররা বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করতেন। হিউয়েন সাং এর সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তিনি ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের সন্তান। হিউয়েন সাং আরো লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভর্তিইচ্ছুকদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো। হিউয়েন সাং পুণ্ড্র বর্ধনেও গিয়েছিলেন। তখন পুণ্ড্র বর্ধনে ২০টি বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং মহাযান ও হীনযানপন্থি বৌদ্ধ ভিক্ষু ওইসব মন্দিরে বাস করতেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজারেরও অধিক বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাং-এর বিবরণী অনুযায়ী তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল ১০টি, ভিক্ষু সংঘ থাকতেন সেখানে এক হাজারের অধিক। কর্ণসুবর্ণেতে ১০টি বৌদ্ধ বিহার, ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল দুই হাজারের অধিক। কর্ণসুবর্ণের অদূরে ছিল সুপ্রসিদ্ধ রক্তমৃত্তিকা বিহার। সেখানে বহু পণ্ডিত ভিক্ষু ছিলেন। সমতটে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল ৩০টি। ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল ২ হাজারের অধিক। হিউয়েন সাং আরো লিখেছেন অধিকাংশ বাঙালি ভিক্ষু ছিলেন হীনযানপন্থি, এক চতুর্থাংশের বেশি ছিল মহাযানপন্থি।

উল্লেখ্য বহু প্রাচীনকাল হতেই ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এক

সময় তক্ষশীলা যেখানে চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ হয়েছিল, খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে হুনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তক্ষশীলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নালন্দা ছাড়া প্রাচীন ভারতে বর্তমান বিহার প্রদেশের ওদন্তপুর (বর্তমানে বিহার শরীফ), বিক্রমশীলা (বর্তমান বিহার প্রদেশে গঙ্গা নদীর তীরে) এবং গুজরাটের বলভীতে ৩টি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বিক্রমশীল মহাবিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি ৬টি মহা বিদ্যালয়সহ ১০৭টি বিহার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সেখানে ১৪৪ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। সম্রাট ধর্মপাল ছিলেন এই বিহারের নির্মাতা।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত হলো ভিক্ষু সংঘ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গৃহী নহেন। তারা বিহার সংঘারামেই বাস করেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের শুরু হতেই দীর্ঘদিন যাবৎ বৌদ্ধরা ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকে পূজা করেনি। পরবর্তীতে বুদ্ধের প্রতীকী চিহ্নরূপে রিক্তাসন, ধর্মচক্র, বোধিপত্র, পদ্ম, পাদুকা, পুতাস্থিকে পূজা করা হতো। বুদ্ধ বন্দনা বা বুদ্ধ পূজার নিমিত্তে ক্রমশ বুদ্ধ দেবাতিদেব হয়ে যান। গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর উত্তর পশ্চিম ভারতে এবং বর্তমান আফগানিস্তানে গ্রীকরা কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই গ্রীকরা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের দেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে পূজা করা শুরু করে। তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য বৌদ্ধরা বুদ্ধের মূর্তিকে পূজা করা শুরু করে। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজা শুরু হয়।

১১৯৯ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুর মহা বিহার আক্রমণ করে শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করেন, বিহারগুলোর মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে দেন, বিহারগুলোকে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। তিনি ওদন্তপুর মহাবিহারকে (বর্তমান বিহার শরীফ) একটি রণ দুর্গ এবং সংঘারামের মুণ্ডিত মস্তক নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে দুর্গের সৈনিক মনে করেছিলেন। বহু যুগ ধরে সঞ্চিত এবং জ্ঞানীগণের জীবনব্যাপী তপস্যা সম্ভূত সুধীমণ্ডলীর প্রাণাধিক প্রিয় পাঠাগারটিকে তিনি অস্ত্রাগার মনে করেছিলেন। পাঠাগারটি দীর্ঘদিন ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। পরে বখতিয়ার সেটি পাঠাগার জেনে অবাক হয়েছিলেন।

তখন পুণ্ড্রবর্ধনের (বর্তমান বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড়) ৩ মাইল পশ্চিমে পোশিপো (ভাসু বিহার) দিনাজপুরের জগদ্দল বৌদ্ধ বিহার, অগ্রপুরী বৌদ্ধ বিহারের খুবই সুনাম ছিল। ভাসু বিহারে ৭ শতের অধিক ভিক্ষুর বসবাস ছিল। তবে হিমালয়ের দক্ষিণে সবচেয়ে বড় বিহারটির নাম হলো সোমপুরী বিহার। বর্তমান নওগাঁ জেলায় এর অবস্থান। প্রায় বর্গাকার এই বিহার উত্তর দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট লম্বা। বিহার এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল সুউচ্চ

কেন্দ্রীয় মন্দির। ভূমি থেকে এখনও এই মন্দিরের উচ্চতা ৭২ ফুট। এটি ছিল সেকালের একটি বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে পাল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপাল বিহারটি নির্মাণ করান। তুর্কী আক্রমণে বিহারটি ধ্বংস হয়ে যায়। ভাসু বিহার, জগদ্দল বিহার এবং অগ্রপুরী বিহারও ওই সময় বা আরো কিছু পরে অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বাংলাজয়ের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে কুমিল্লার শালবন বিহার, ঢাকার বিক্রমপুরী বিহার, সাভার (ঢাকা) এবং অন্যান্য অনেক বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

রাজধানী ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ধামরাই অবস্থিত। ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য তার প্রবন্ধ ধামরাই : বৌদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান এ উল্লেখ করেছেন যে– কথিত আছে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য ৮৪,০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সেই ধর্মরাজিকা হতে ধামরাই নামের উৎপত্তি। ধামরাইয়ের মোকামটোলা বাজারে শাহ সাহেবের দরগায় এখনো বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন– দুই বৃহৎ অশোকস্তম্ভ যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে। ধামরাই থানা সদর হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুয়াপুর, নান্নার এবং বাজাসন গ্রাম অবস্থিত। এ তিনটি গ্রামে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। নান্নার জমিদার বাড়ির কিছুটা দক্ষিণে কয়েকটি ঢিবি এখনও বিদ্যমান, যদিও এখন ঢিবিগুলো নানা গাছপালায় আচ্ছাদিত। ঢিবিগুলো খুঁড়লেই বৌদ্ধ বিহারের অনেক ইট ও পাথর পাওয়া যায়। এখনও নাকি আশপাশের লোকজন ঢিবি খুঁড়ে ইট পাথর নিয়ে যায়। উল্লেখ্য রাজাসন শব্দটি বজ্রাসনের অপভ্রংশ। বজ্রাসন বৌদ্ধ যোগী এবং তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত আসন। নান্নার ও সুয়াপুরের সন্ধিস্থলে যেসব উচ্চ ঢিবি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে, তাতে এক সময় সুবৃহৎ বিহার অবস্থিত ছিল বলে এলাকার সকলের বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন শাহ সাহেবের দরগা ও পাঁচ পীরের দরগা ধামরাইতে অবস্থিত। (সম্বোধি পৃষ্ঠা– ১৯-২১)।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) নামক গ্রন্থে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. মমতাজুর রহমান তরফদারের 'বাংলার ধর্ম জীবন' প্রবন্ধ হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল।

'লামা ধর্মস্বামীর বিবরণে ১২৩৪-৩৬ সালের উত্তর মগধের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের একটি রেখাচিত্র পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব ভারত তখন রীতিমতো রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার কবলে। তুর্কী সেনাবাহিনীর আগমনের ভয়ে বৈশালী পরিত্যক্ত হয়েছিল। দিনে লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেত আর রাতে ফিরে আসত। বুদ্ধগয়ায় মাত্র ৪ জন ভিক্ষু ছিলেন, আর সবাই চলে গিয়েছিলেন। প্রাচীন মহাবোধি প্রতিমা প্রাচীর তুলে ঘিরে রাখা

হয়েছিল। একটি পার্শ্বকক্ষে একটি নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ভিক্ষুরা স্থানটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ধর্মস্বামী ও সাতদিন পালিয়ে ছিলেন। মুসলিম সৈন্যরা বিদায় নেয়ার পর তারা ফিরে এসেছিলেন। নালন্দার অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। এখানে ছিল ৭টি মন্দির এবং চৌদ্দটি বড় ও চুরাশিটি ছোট বিহার। আক্রমণকারী সৈন্যরা এইসব বিহার মন্দিরের ক্ষতি সাধন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেউ ছিল না। শুধু ধান– বা ও ঘুন-বা নামক বিহার ২ টিতে ধর্মীয় শিক্ষাগত কাজকর্ম হতো। মাত্র সত্তুর জন ভিক্ষু পণ্ডিত সেখানে ছিলেন। আর ছিলেন নব্বই বছরের বৃদ্ধ মহাপণ্ডিত রাহুল শ্রীভদ্র। এদের ভরণপোষণ করতেন বুদ্ধ গয়ার রাজা বুদ্ধ সেন এবং ওদন্তপুরীর জয়দেব নামক রাহুল শ্রী ভদ্রের জনৈক ধনী গৃহী ব্রাহ্মণ শিষ্য। এই ব্রাহ্মণ ওদন্তপুরীতে মুসলমান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তিনি গুরু ও শিষ্যদেরকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গুরু রাহুল শ্রী ভদ্র ও তার একমাত্র শিষ্য ধর্মস্বামী তখন জগন্নাথ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনশত মুসলিম সৈন্য সেখানে এলো। কাহাকেও না দেখে তারা চলে গেল। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রবেশদ্বারসহ নালন্দার আবেষ্টনী প্রাচীর তখনও বিদ্যমান ছিল। পূর্ব দিকের প্রবেশ তোরণে একটি রং করা তারামূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। ধর্মপালের রাজত্বকালে নালন্দা বিহারের সমৃদ্ধি ও মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। নালন্দার ধর্মপীঠ গয়ার মহাবোধির নিকটবর্তী ছিল বলে সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজরা বিহার মন্দির তৈরি করাতেন এবং বিভিন্ন দেশের আচার্য্য পণ্ডিতগণ সেখানে জ্ঞান চর্চা ও ধর্মচর্চা করতেন। বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রেই এই রাজরাজরা ও পণ্ডিতদের সঙ্গে পাল রাজাদের যোগাযোগ ঘটত। মহীপাল ও জয়পালের রাজত্বকালে বিক্রমশীল ও সোমপুর বিহার ভারতে এবং ভারতের বাইরে ধর্মীয় ও জ্ঞানগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কাশ্মির তিব্বত ও অন্যান্য দেশের ভিক্ষুশ্রমণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই দু'টি বিহারে বহু গ্রন্থ রচনা এবং অনুবাদ ও অনুলিপি তৈরি করেছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব এই সময়েই। কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিত তিব্বত, চীন ও সিংহলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একাদশ শতকের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং ত্রয়োদশ শতকের রামচন্দ্র কবি ভারতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (পৃষ্ঠা- ২৬০)

তের শতকের প্রথমদিকে বিক্রমশীলা বিহারের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মস্বামী যখন মগধে তখন এই ধর্মপীঠ নিশ্চিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তুর্কী সৈন্য বিহারটিকে ভূমিসাৎ করে তার ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। ওদন্তপুরীর বিহার একজন মুসলিম সেনা অফিসারের আবাসগৃহে পরিণত হয়েছিল। (পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯)। তিনি আরো লিখেন 'সোমপুর বিহার ধর্মপালের সময়ে নির্মিত হযেছিল। এই

মহাবিহারে মহাপণ্ডিত আচার্য্য বোধিভদ্র বাস করতেন। তার কতকগুলো গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিমা ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের ভগ্নবিশেষ উপরোক্ত তথ্যগুলোর পরিপূরক। বাংলার বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বৌদ্ধ বিহার মন্দিরগুলোতে জ্ঞান চর্চা ও ধর্মচর্চা হতো। বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বাংলার বিহার সংঘারাম ও বৌদ্ধ পণ্ডিত সম্বন্ধে আরো কতগুলো তথ্য এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। সোমপুর বিহার ধর্মপালের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এই মহা বিহারে মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র বাস করতেন। তার কতগুলো গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অতীশ দীপঙ্করও কিছুদিন এই বিহারে ছিলেন। তিনি ভাব বিবেকের একটি গ্রন্থ 'মধ্যমকরত্নদ্বীপ' তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সোমপুর বিহারের বীর্যেন্দ্র নামক জনৈক মহাযানী বিনয়জ্ঞ বৃদ্ধ স্থবির দশম শতকে বুদ্ধ গয়ায় একটি বিশাল বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

... একাদশ শতকের শেষ দিকে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে উৎকীর্ণ বিপুল শ্রী মিত্রের প্রশস্তি লিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে, আচার্য্য করুণাশ্রী মিত্র বঙ্গাল সৈন্যদের আক্রমণের সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এই বিহারে মারা পড়েছিলেন। বিপুল শ্রী মিত্র সোমপুর বিহারে তারা দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন, দগ্ধ বিহারটির সংস্কার করিয়েছিলেন এবং বুদ্ধ মূর্তির জন্য স্বর্ণালংকার দান করে নিজে সেখানে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। প্রফেসর তরফদার আরো লিখেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও দেব মন্দির ছিল। ১০১৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুলিখিত এবং চিত্রিত একটি 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থে কতকগুলো দেব মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তির চিত্রিত রূপ পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দণ্ড ভুক্তিতে যজ্ঞ পিণ্ডি গ্রামে লোকনাথ, পুণ্ড্রবর্ধনে ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারক, রাড়ে কন্যারাম, রামজাত ও বৈত্রবনাগ্রামে লোকনাথ, তাড়িহা গ্রামে তারা; বরেন্দ্রে তুলাক্ষেত্র গ্রামে ও হলদি গ্রামে লোকনাথ, উড্ডিয়ানে (বজ্রযোগিনি গ্রামে) মঙ্গকোষ্ঠ বজ্রপানি, পাট্টিকেরে বরভবনে চুন্দা, সমতটে বুদ্ধর্ধি ভগবতী তারা, চন্দ্রদ্বীপে ভগবতী তারা, হরিকেল দেশে শিলা লোকনাথ ইত্যাদি। (পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬১)।

খড়গ, পাল ও চন্দ্র রাজাদের তাম্রলিপিগুলোর প্রথমেই উৎকীর্ণ বুদ্ধ বন্দনায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর পূর্বদিকে আশরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত দেব খড়গের দুটি তাম্র শাসন (৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে জানা যাচ্ছে যে রাজা দেব খড়গ এবং তার পুত্র

রাজরাজ আচার্য্য সঙ্ঘমিত্রের চার পাঁচটি বিহার ও একটি বুদ্ধ মণ্ডপের জন্য ভূমি দান করেছিলেন। ভূমিদানের এই দলিল দুটির বুদ্ধবন্দনায় এবং দান কর্মের মানসিকতায় ত্রিরত্ন বা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি রাজার ও তার পুত্রের শ্রদ্ধাভক্তি ও ধর্মীয় নীতি প্রকাশ পেয়েছে। খড়গ রাজাদের লাঙছন ছিল বৃষ। সপ্তম শতকের সমতটের জনৈক পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণ রাতের মহা সান্ধি বিগ্রহিক বৌদ্ধ জয়নাথ একটি বৌদ্ধ বিহারের আর্য্য সংঘের লিখন পঠন, চীবর এবং আহারাদি সংস্থানের জন্য ভূমিদান করেছিলেন। তাদের তিনটি শিলালেখ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই 'পরম সৌগত' রাজাদের বংশপ্রতীক ছিল ধর্মচক্র ও মৃগ। এই বংশের চতুর্থ বা শেষ রাজা ভবদেবের রাজত্বকাল দেব পর্বত থেকে উৎকীর্ণ একটি তাম্রলেখে বলা হয়েছে যে তিনি বেন্ডমতি বিহারিকের জন্য সাড়ে সাত পাটক জমি দান করেছিলেন। নবম শতকের দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের রাজা কান্তি দেব এবং দশম শতকের গৌড়পতি কম্বোজ রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সমতটের চন্দ্রবংশের রাজত্বকাল খ্রিষ্টীয় নবম দশম শতকের সন্ধিকাল থেকে শুরু করে একাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই বংশের রাজারা ছিলেন 'পরম সৌগত' বৌদ্ধ। তাদের তাম্র শাসনগুলোতে উৎকীর্ণ যুগল মৃগমূর্তি ও ধর্মচক্রের প্রতীক বোধহয় ছিল তাদের রাজবংশের লাঞ্ছন। তাদের কয়েকটি তাম্রশাসনের বন্দনা অংশে 'মহানুভব বুদ্ধ সঙ্ঘে'র প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ আছে রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের একটি তাম্রলিপিতে। ময়নমতীতে প্রাপ্ত এই তাম্র লেখে উল্লিখিত হয়েছে যে রাজার কর্মচারী 'অশ্ব নিবন্ধক' পট্টিকের নগরে অবস্থিত দেবী দুর্গোত্তারার মন্দিরের জন্য বোজখণ্ড গ্রামে ২০ দ্রোন ভূমিদান করেছিলেন। বিহার-মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান বিহারাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, ধর্মীয় সৌধাবলির সংস্কার সাধন এবং বৌদ্ধ আচার্য্য ও পণ্ডিতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পোষকতা প্রদান ছিল 'পরম সৌগত' বৌদ্ধ পাল রাজাদের ধর্মনীতি ও রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সাড়ে তিনশ বছরের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে মধ্যবঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য মিলছে গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবের রাজত্বকালে ১২১১ শকাব্দে বা ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের একটি চিত্রিত পাণ্ডু-লিপিতে। বস্তুত, তাম্রশাসন ও ধর্মীয় সৌধাদির ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি প্রত্নবস্তু এবং ভারতীয় ও মগধের বৌদ্ধ রাজাদের স্বধর্মপ্রীতি এবং এই ধর্মের প্রতি তাদের সঠিক আনুকূল্য প্রদান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

অন্যান্য ধর্মের প্রতি এই রাজাদের বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা ছিল না। বরং প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বৌদ্ধ শাসকগণ হিন্দু ধর্মের প্রতি উদার,

পোষকতামূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পাল ও চন্দ্র রাজরা কর্তৃক ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান এবং হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট লিপি প্রমাণ আছে। লালমাই ময়মনামতি অঞ্চলের চারপত্র মুরায় প্রাপ্ত লড়হ চন্দ্রের (খ্রি: ১০০০-২০) তাম্র লেখের শুরু হয়েছে বাসুদেব বন্দনার মধ্য দিয়ে। সন্দেহ হয় এই রাজা বুঝি বৈষ্ণব বনে গিয়েছিলেন। তাম্রলেখ দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি লড়হ মাধব ভট্টারক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই দেবতার জন্য ভূমিদান করেছিলেন। কিন্তু সন্দেহ দূর হয়, যখন তাম্রলেখ দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে তার 'পরম সৌগত' উপাধি এবং ধর্মচক্র ও উপবিষ্ট যুগল মৃগের লাঙছন। বেশ কয়েকজন পালরাজা হিন্দু নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পাল বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা ধর্মপালের (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) সময় থেকে শুরু করে নারায়ণ পালের (৮৬৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর তাও ছিলেন বংশানুক্রমে। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর তাদের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পঞ্চম শতকের প্রথম থেকেই পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হচ্ছিল। সপ্তম অষ্টম শতক থেকে বুদ্ধের শক্তি করুণা ও অবলোকিতেশ্বরের শক্তি প্রজ্ঞা পারমিতার উপাসনার মধ্য দিয়ে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে শক্তি পূজার সূচনা ঘটেছিল। তখনো তন্ত্রধর্ম প্রাধান্য পায়নি। খ্রিষ্টীয় নবম শতক থেকে মহাযান বৌদ্ধমতে তান্ত্রিকতার স্পষ্ট ছাপ পড়ছিল।

প্রফেসর তরফদার আরো লিখেন, সাহিত্যিক ও প্রত্নতথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, চতুর্থ পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে পূর্ব ভারতে বিহার সংঘারাম কেন্দ্রিক বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও অবক্ষয় ঘটেছিল। বিহার মন্দিরগুলোতে ভিক্ষুরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন, ছবি আঁকতেন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও লিপিবিদ্যা চর্চা করতেন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রন্থ লিখতেন, বিদেশী ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করতেন, টীকাও লিখতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি খড়গ দেব, পাল, কম্বোজ ও চন্দ্র রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল।

... কর্ণসুবর্ণ, পাহাড়পুর, মহাস্থান, লালমাই ময়নামতি অঞ্চলের বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ ও ধর্মী পীঠগুলোর নদীতীরে অবস্থান সেকালের বৌদ্ধ সমাজের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদের রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংস স্তুপের মধ্যে স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। ময়নমামতিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরে পালযুগের এক শ্রেণীর দুষ্পাপ্র্য তাম্রমুদ্রা প্রাপ্তি অতি মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়া। এখানে সুলতানী আমলের ও কতকগুলো রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান মিলেছে। ময়মনামতি ও পাহাড়পুড়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কের প্রমাণ এই দুটি স্থানে আব্বাসীয় মুদ্রার আবিষ্কার।

মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ী ডাঙ্গা এলাকায় খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত নির্মাণযুগ বা প্রত্ন পর্যায়গুলো খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে পড়ে। পূর্বে উল্লিখিত বিপুলশ্রী মিত্রের প্রশস্তিলিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পরও সোমপুর বিহারের সংস্কার করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা- ২৬১-২৬৬)

সেই মধ্যযুগে চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার নামে একটি মহাবিহার ছিল। সেই বিহারেও কয়েকশ ভিক্ষু বাস করতেন। সেটিও ছিল একটি শিক্ষালয়। তের শতাব্দীতে সেই বিহারের একজন বানরত্ন ভিক্ষু ভূটানে গিয়েছিলেন। এখনও তিনি ভূটানে একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এক সময় সেই বিহারটিও লুপ্ত হয়ে যায়, সম্ভবত বহিশত্রুর লুণ্ঠনের ফলে। সেই বিহারটি চট্টগ্রামের কোন স্থানে ছিল এখন সেটিও কেহ বলতে পারে না। তাছাড়াও বর্তমান কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত রামু থানার কাছে রামকোট নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। মহাবিহারটি নাকি সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এক সময় সেই বিষয়টিও ধ্বংস হয়ে যায়। এরকম ছোটবড় অসংখ্য বিহার মন্দির বিভিন্ন শহর বন্দরেও ছিল। তাছাড়াও গ্রামেগঞ্জে শত শত বিহার ছিল। মহা বিহারগুলোকে ধ্বংস করা হলে এবং শত শত ভিক্ষুকে হত্যা করা হলে,শহর-বন্দর এবং গ্রামগঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারগুলোর ভিক্ষুরাও যে যেখানে পারে পালিয়ে যায়। ফলে বিহারগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম এদেশ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রফেসর তরফদার আরো লিখেন মহাস্থানে সম্প্রতি আবিস্কৃত বৌদ্ধ মন্দিরটির মৃৎফলকগুলো একাদশ শতকের তৈরি। মিনহাজ ও ধর্মস্বামীর বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি, দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে এবং ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কী সৈন্যরা উত্তর মগধের বিহারগুলোর ক্ষতি সাধন করেছিল। এই আক্রমণের সংবাদ সীতাকোট, মহাস্থান, পাহাড়পুর ও কর্ণসুবর্ণে পৌছবার পর ভিক্ষুগণ পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। দিনাজপুরের দেবী কোটে অবস্থিত তুর্কী প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে সৈন্যদের যাতায়াতের পথও ছিল এই স্থানগুলোর পাশ দিয়ে। মুসলিম আক্রমণ না ঘটলে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের সংঘারাম গুলোকে কেন্দ্র করে জীর্ণ অবক্ষয়িত বৌদ্ধ ধর্ম হয়তো বা আরো কিছুদিন টিকে থাকতো। সমগ্র ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সমতট অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসেনি। সেজন্য সেখানে মহাযানপন্থি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম টিকেছিল। (পৃষ্ঠা- ২৬৬)।

উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতনের ব্যাপারে 'The World of Buddhism' এ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

Several invasions by Iranian tribes disturbed the region and Buddhism suffered a series of setbacks, though these proved to be temporary. In the 1st. century B. C. the Greek Kingdoms were conquered by the Sakas (Scythians); a hundred years later they in their turn were overturned by the Pahlavas (Parthians) who built up short lived Kingdoms in the north east; Both Sakas and Pahlavas began by destroying Buddhist monuments, stupas and monasteries, but their attitudes quickly changed. Taxila was rebuilt on the line of Greek town planning. The Dhammarajika stupa founded by Asoka was enlarged and inscriptions record extensive building activities and rich gifts to the Sangha. From now on Buddhism flourished and expanded steadily; the Kushan empire was founded at the beginning of the 1st. century AD and from its center at Bactria pushed its frontiers across the whole of North India and parts of Chinese Turkestan, Afghanistan, eventual by taking Ujbekistan and Tajikistan as far west as Chwaresm. From the comparatively few records of the huge empire available today- chiefly coins and archaeological evidence- we can piece together a picture of a strong political power embracing a wide territory and bringing peace and prosperity to the greater part of central Asia. During the 3rd. century the emerging power of the Sasanians in Iran became a growing threat to the Kusanas. Gradually they were driven back from west to east, though why and when the empire finally collapsed is a matter of conjecture. The religion of the Sasanians was Zoroastrianism, but they seem to have continued a policy of relative tolerance towards Buddhism.

After the fall of the Kusana Empire we find a collection of petty kingdoms, all apparently fairly prosperous and friendly to Buddhism. Kings embellished their capitals with temples, monasteries and stupas. Between the 3rd. and 5th. centuries the beautiful stupa at Jaulian in Taxila was erected and enlarged, the heavily decorated stupas of Hadda were built and the cave Monasteries were dug into the mountain at Bamian.

This was the zenith of Buddhism in western Central Asia. It encountered a severe chek with the invasion by the White Huns (Also called Hephthalites) who conquered Gandhara and Taxila on their way into India during the second half of the 5th century.

... Although it is true that Taxila and Gandhara were damaged considerably, in the more western areas monasteries hardly suffered at all. There had, however, been a marked decline of Buddhism by the time Hsuang Tsang visited this region in the early 7th century: in Hadda he found a pious Buddhist laity but so few monks that they were hardly able to look after the large monasteries properly.

A second perhaps even more decisive factor in the decline was the revival of Hinduism, a pressure which made itself felt in the border regions after it had gained in India proper at the time of the Guptas. The numerous Sahi dynasties inherited Kushana Empire in Afghanistan and further west mostly professed Hinduism. Not exclusively however some were Buddhists. The Patola sahis of Gilgit, only recently emerging from the darkness of history, evidently favoured Buddhism. (Page 100-102)

গ্রন্থটিতে আরো লেখা হয়, 'Although Buddhism had survived several ups and downs caused by political changes, a real threat to its very existence arose in the west after the Arab defeat of the last Sasanian ruler in AD 642, when the way into the central Asia lay open to the Arab military leaders.

The encounter between Buddhism and Islam did not, however, result in the immediate destruction of monasteries or in anything like the horrible massacres of monks that occurred later in the northern India, Buddhism and Islam existed side by side for centuries in many places, for instance at Bamiyan, Even long after the coming of Islam a remarkable revival of Buddhism was possible at Merv in the days of the Mongol invasion of the 13th century. Indeed close contacts seem to have persisted between the two religions over a long period of time. Only recently Buddhist texts have been identified that were translated in to Persian by a

Muslim author of the 14th century, thus showing that Buddhism was still alive at that time in Iran. In the field of architecture, Buddhism even influenced some of characteristics building types of Islam. The theological Schools (Madrasas), for instance, seem to have developed on the model of Buddhist monasteries. (Page: 107)

আর প্রাচীন ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য এবং মন্দির নির্মাণ ও ধ্বংসের ব্যাপারে গ্রন্থটিতে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'The existence of thousands of monasteries in classical India is attested by literary records and archaeological remains. Besides the ravage of time, human vandalism paractised first by Brahmanical Hindus and later on by invading Muslims was responsible for the destruction of numerous Buddhist establishments in most parts of India. Archaeological explanations at many places suggest that Hindu and Muslim structures were built on Buddhist sites with materials taken from Buddhist buildings.

A large number of monasteries flourished in northwest India. The well-known sculptures of Gandhara School of art were produced between 100 BC and 500 AD in the monasteries of this region. The ruins at Taxila Manikiala near Rawalpindi, at Charsada, Shahajiki Dheri near Peshawar, at Takhti Bahi, Sahri Bahlol and Jamalgarhi near Mardan and at Mirpurkhas in Sindha, seem once to have been among the architectural wonders of Asia. In the 6th century the Huna King Mihirkul caused the demolition of 1600 Buddhist establishments in northwest India. Hsuan-Tsang (AD 629-645) recorded that in former days 18,000 monks lived in 14,00 monasteries in Uddiyana in the Swat valley. The names of four monks- Sanghamitra, Bhava, Nagadatta and Dharmatrata are preserved in inscriptions of the 1st century AD discovered in the region.

Many monastic establishments existed in Mathura between 300 BC and AD 600. Saka and Kushana monarchs patronized Buddhist monks and their monasteries and promoted Buddhist art

in Mathura, Sravasti Saranath. Life-size figures some of these monarchs and some of the finest images of Buddha were made in Mathura. Inscriptions of the 1st and 2nd centuries AD found in Mathura reveal the names of nuns (Buddha mitra and Dhanavati) and of monks (Buddha Deva, Buddhila, Bala, Buddha varma and Sangha Dasa). Fahsien (AD 399-411) reported the existence of 20 monasteries and 3000 monks in Mathura. The famous Jetavana monastery at Sravasti continued to be a centre of Buddhism till 12th century, when Buddha bahattaraka was the head of the Sangha there. Among the ruins of monasteries and temples at Kushinagara was found a 20 feet long stone figure of the Buddha in the posture of final Nirvana, which was made in the 5th century AD.

One of the largest monastic settlements of India was Saranath, just outside Benares. Ruins of numerous large and small monasteries can still be seen there. Two of the first Buddhist monasteries were built at this site in the time of the Buddha. Asoka had some monasteries and stupas built and set up a monolithic pillar surmounted by a lion capital. Its figures of four roaring lions facing the four cardinal directions symbolize the Buddhist preaching which is likened to a lion's roar. This remarkable sculpture has been adopted by modern India as her state emblem. Inscriptions refer to certain monks as donors. Saranath, like Mathura was a major centre of Buddhist religion, art and literature, one of the master pieces produced here is the Buddha figure seated in preaching posture. The Dhamekha Stupa is another imposing monument. Kumaradevi, a Buddhist queen of the Brahmanical king Govinda candra of Kanauja, built Dharmacakra rajina Vihara one of the last monasteries to be founded in medieval India. The soldiers of Muhammad Ghori killed most of the monks and destroyed the monasteries of Sarnath in AD 1194.

A rock monastery lay in Pabhosa near Kosambhi in which arhats of the Kasyapiya sect lived in the 1st century Bc. Buddha

mitra, a nun had a Buddha image set up near the Ghositarama monastery at Kansambhi in the 1st century AD. Hunas ransacked this city in the 6th century.

No ancient monastery building has been preserved at Bodhgaya, the site of the Buddha's Enlightenment. Meghavarma, a King of Ceylon, had a large monastery constructed here in the 5th century for the use of Ceylonese monks, Sasanka, a Brahmanical King of Bengal, is reported to have persecuted Buddhism in and around Bodhyaya early in the 7th century. The most important monument here is the Mahabodhi Temple, which now again stands in its magnificent grandeur, having been restored in the 19th century. Bodhagaya was subjected to violent vandalism by the Muslim invaders at the beginning of the 13th century.

Nalanda was the greatest centre of Buddhist monks and scholars in ancient Asia. Traces of earlier monasteries have disappeared but the extant of ruins give a continuous history of monasteries, sculptures and patronage from about the 7th to the 12th century. The accounts of the Chinese pilgrim scholars Hsnan Tsang and I-Tsing reveal something of the greatness of its Buddhist University. They mention its thousands of scholars, numerous temples, monks' hostels, libraries observatories and prayer halls. Nalanda inscriptions preserve the names of the two disciples Sariputra and Maudgalyana and eminent monks such Vasu mitra, Maitrey natha, Purnendra Sena, Manju srideva and Viradeva. The monasteries, libraries and temples of Nalanda were devastated in the closing years of the 12th century by the Turkish armies under Ikhtiar Khilji, who slaughtered most of the monks living there. Dharmas Vamin (1197-1264) from Tibet spent some months in Nalanda in the early years of the 13th century when he found only two out of eighty four monasteries in good condition.

The rulers of Pala dynasty (AD 800-1200) established at least four great monasteries, which developed into centres of Buddhist

learning and literature. All of them were destroyed by Muslim armies in the 12th and 13th centuries. The ruins of Odantapura Maha Vihara are still buried in Bihar sharif near Nalanda; the site of Vikramasila mahavihar has so for not been located, although it seems to have been in the Bhagalpur District of Bihar. The ruins at Paharpur in East Bengal represent the site of Somapura Mahavihar. The last monastery built by a Pala King at Varenda in north Bengal was founded by Rampala and called Jagaddal Mahavihar. A large number of learned Buddhists monk scholars associated with Nalanda University and Colleges of the Pala Monasteries are known to us from Chinese and Tibetan sources.

Two sites in central India deserve mention here for their remarkable architectural and sculptural wealth, Bharhut (District Bagel Khand) and Sanci (District Bhopal). Both had monasteries and sanctuaries dating from the 3rd century BC. At Bharhut only ruins of a monastery and mutilated sculpture belonging to a great Stupa have survived. About 140 short inscriptions exist on stones, which once formed part of the great shrine. Names of several monks and nuns figure among donors. Some of the monks were reciters of the scriptures, while others were masters of particular Sutras or of five collections of sutras. A monk named Buddha raksita is described as a sculptor, while another named Rsipalita is referred to as a superintendent of construction. Some of the other names mentioned in these inscriptions are those of nuns and monks.

Some of the oldest and finest Stupas still exist at Sanci; the gateways to these masterpieces of architecture and sculpture around these Stupas are the ruins of several monasteries. Sanci was a major centre of Buddhist monasticism, art and culture during the period between 200 Bc. and AD 600. A noteworthy feature of the monuments of Sanci is the existence of several hundred short inscriptions; one is an edict of Asoka prohibiting schism among monks and nuns. Mahendra, who converted Ceylon, is associated with the Vedisagiri monastery of Sanci. Names of numerous monks and nuns of 200 BC to AD 200 are

recorded among donors of different parts of the Stupas. Another important feature of this site is that the relics of a large number of eminent 'sons of the Buddha' were enshrined here. The inscriptions refer to the relics of Kasyapa gotra, the teacher of Haimavatas, Madhyama, Maudgliputra, Maudgalayagna, Sariputra, Haritiputra Kaundiniputra, Kausikaputra, Gauptiputra and Vatsi-Suvijayita. These inscribed relic caskets corroborate the evidence of the Pali chronicles, which name several of these monks as leading missions to outlying parts during Asoka's reign. The sculpture of Sanci are thus an important source for Buddhist history, faith and mythology.

A large number of monasteries and shrines existed in Andhrapradesh. Ruins of monastery buildings and Stupas have been excavated at Battiprolu, Jaggayapeta, Amarabati and NagarjunaKonda were active centres of several sects of Maha Sanghakias and Sthaviravadings. The Battiprolu relic casket inscription refers to a conference of arhats. The decline of Buddhist monks and monasteries in South India had begun after the 7th century. But Buddhist icons continued to be made and revered till the 15th century· A 14th century inscription at Kandi in Srilanka refers to one Dharmakirti's repairs to a Buddhist temple at Amarabati.

Buddhist Monasteries and temples in Sindha were demolished by Arab invaders under Mohammed Kasim in AD 712. His soldiers slaughtered a large number of Samanis (Sramanas), who shaved their heads and beards. Another report says that Kasim had spared 1000 Buddhist monks in Sindha, ruled over by King Candra who was a Buddhist monk. Toward the end of the 8th century the Arabs swooped down upon the prosperous monasteries of Gujarat and destroyed the Buddhist University at Valabhi on the seacoast. Inscriptions of Maitraka rulers of Gujarat belonging to the period AD 500-700 mention about one dozen spacious monasteries at Valabhi where learned and virtuous monks lived.

Excavation of rock monasteries for the use of Buddhist monks and nuns started on a large scale early in the 2nd century

B.C. in the mid-South-West of India; the latest were dug in the 9th century AD in Rajasthan. The most important centres of rock monasteries are Maharastra, Madhyapradesh, Guzarat and Rajasthan. The total number of them in India exceeds 1000. Those at Karle, Bhaja, Bedsa, Kanheri, Kondane, Junnar, Kuda, Nasik, Ajanta, Pital khora, Ellora, Aurangabad and Bagh have been studied in some details. These rock-cut hills contain a marvelous wealth of architecture, sculptures and painting, but no Buddhist monk now lives in any of them. A complete rock monastery has three functional features: a series of small rooms with rock beds and rock pillows for use of monks (Bhiksugrha), a pillared hall (Mandapa) for conducting religions ceremonies and holding of the Sangha and a sanctuary (caity-hall), usually containing a rock cut Stupa or Caitya, sometime with figures of the Buddha on it. Much of the decorative art found in these monasteries and shrines illustrates the life of the Buddha and subjects drawn from folk mythology. (Page 95-98)

আর প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার এবং অবশেষে এর বিলুপ্তি সম্পর্কে একই গ্রন্থে ভিন্ন অধ্যায়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'Asoka did more than any other individual to spread Buddhism. Buddhist tradition has it that in the middle of his reign about 250 Bc. monks set out from central India to travel in all directions towards and beyond his borders. Some scholars connect these missions with Asoka's own statement in his edicts that he sent emissaries to foreign rulers and conquered them by 'righteousness' (dharma). Unfortunately, it may not be possible to match the destinations of the emissaries with those of the alleged missions. There is reason to be sceptical about the traditional story, though what may be well be true is that a mission led by the monk Mahindra, who was a son of Asoka, brought Buddhism (in its Theravadi form) to Srilanka. For the rest, the tradition may be over-simple in presenting various visits of monks to outlying regions as a simultaneous and coordinated enterprise. But there can be no doubt that it has a symbolic truth in recording how

Asoka's patronage enabled Buddhism to spread and the Sangha to establish it self in ever wider territory.

Several Indian Kings patronized Buddhism; but no Buddhist state was ever established in India. The Indian tradition, to which most kings adhered, was that the king should protect all religious, whatever his personal convictions. Srilanka was the first, and for a longtime the only Buddhist state.

Buddhism spread into Southern India in the time of Asoka and lasted there longer than in the north; evidence is fragmentary, but we hear of a Theravadian monk being invited from Kanci (Conjeevaram) in Tamilnadu to Srilanka as late as the early 14th century, about a century after the Muslims had delivered the coup de grace to Buddhism in northern India by sacking the monastic Universities of Bihar and Bengal. By land Buddhism spread first in to eastern Iran and central Asia and then along the caravan routes into China; Striking evidence that the move north-west out of India began early is the Asokan inscription in Greek and Aramaic found at Kandahar (now (Afghanistan). By Sea it spread from the east coast, in the middle of the 1st Millennium AD, to continental south East Asia and Indonesia. Some of the greatest Buddhist monuments notablyBorobuder in Java and temples in Angkar in Kampuchea, are due to this seaborne expansion. To part of central and most of South East Asia the Buddhist missionaries brought or helped to bring their first system of writing the Indian script in one or other of its variants and many other aspects of Indian civilization.

The nearest thing we have to census of monks and monasteries in ancient India in the record compiled by Hsuan Tsang between AD 630 and 644. He listed them by area. India for him included Srilanka, what is now Bangladesh, much of what is now Pakistan and Afghanistan and a bit of modern Nepal. If we exclude Srilanka (with 20,000 monks) his totals come to about 115,000 Hinayna and 120,000 Mahayana monks; however, about half of the latter also studied Hinayana (may be this just means that they belonged to one of the older Vinay Sects), The Hinayan

had about 2000 monasteries and the Mahayana about 2500.

Hsunan Tsang sadly noted that in some areas there were many ruined monasteries. Buddhist monasteries were tempting targets for invaders and occasionally also for rapacious local rulers, because many of them were rich. A monastery could attract donations, but monks, who observed the Discipline, could consume very little, so all they could do with their wealth was to invest it. Often they invested it in real estate: they could own whole village and indeed their inhabitants. In the western Deccan (modern Maharastra) the great monastic temples cut into the rock, culminating in Ajanta, seem to have been paid for by traders whose business they in turn financed. The evidence is only indirect, but it does seem likely that Buddhist monasteries were among India's earliest and most important capitalists.

Around AD 1200 Nalanda was sacked for the last time. A Tibetan monk, Dharmas vamin, has left us a tragic vignette of the extinction of the Sangha in the area where once the Buddha trod. Visiting Nalanda in 1235 he found that not one manuscript remained. A single monk, in his nineties, was teaching Sanskrit grammar to a class of seventy pupils. Dharmas vamin studied under him. When they were warned that Muslim soldiers were approaching, he carried his teacher on his back, like Aeneas saving Anchises from the sack of Troy. The two monks hid until the raid was over, then returned and finished their course. (Page 83-84)

আর সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের উপর লিখিত পুস্তকাদি বিলীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একই গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'Most of the important Buddhist scriptures were translated into Chinese several times and in different versions. Later from the 7th or 8th century on they were also translated into Tibetan. These translations are of crucial importance now because many of the originals, in Sanskrit and other Indian languages, have been lost: they were preserved orally by monks and in writing in monastic libraries, but the monks were killed and dispersed and the

libraries were destroyed by Muslim invasions between the 8th and 13th centuries, Thus the literature of Indian Buddhism is now available mainly in Chinese and Tibetan translations. Though the Chinese translations are more numerous and were generally made earlier, the Tibetan ones are usually the best for reconstructing the Sanskrit originals, because they were made almost mechanically, word for word, rather creating their own dialect of Tibetan 'translationes' than attempting to conform to a pre-existent language. (Page 78)

বহিঃশত্রুর আক্রমণে মহাবিহারগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে এবং শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত এবং আহত হলে বাকিরা এবং ছোট বিহারের ভিক্ষুরা জীবন রক্ষার্থে নেপাল, ভূটান, তিব্বত, বার্মা, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে পালিয়ে যান। ভিক্ষুসংঘের অভাবে গ্রামগঞ্জ এবং শহরে শত শত বিহার পরিত্যক্ত হয়ে যায়। গৃহী বৌদ্ধরা নির্জীব, দিশেহারা এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর তাদের অনেকেই হিন্দু হয়ে যায় এবং অনেকেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন অনেক বৌদ্ধ বিহার হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয় এবং অনেক বৌদ্ধ মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এদেশ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধরা টিকে থাকে, কারণ তখনও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ শাসিত আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল।

আমাদের দেশের লোকদের একটি ভুল ধারণা আছে। সেটা হলো অনেকেই মনে করে থাকে যে আমাদের দেশের মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার যেসব স্থানে বড় বড় বৌদ্ধ বিহার ছিল, সেসবের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে, সেসব এলাকার অধিকাংশ লোকই তো এখন মুসলমান। যেমন রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, সাভার, ঢাকার বিক্রমপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রামে বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। ওইসব এলাকার অধিকাংশ লোক তো এখন মুসলমান। বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছে বলেই তো প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর আশেপাশের বর্তমান লোকজন প্রায় মুসলমান। বৌদ্ধ হতে পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলেই তো এখনও বৌদ্ধদের আচার সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানদের আচার সংস্কৃতিরও অনেক মিল রয়েছে। এসব পরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায় ছিলেন একজন আইসিএস অর্থাৎ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা। ব্রিটিশ আমলে একসময় নওগাঁ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) এসডিও (মহকুমা শাসক) ছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ

'নব্বই পেরিয়ে'তে লিখেছেন তিনি মহকুমার নিয়ামতপুর থানার গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। সেখানে দেখেছেন পথেঘাটে পড়ে থাকতে অজস্র পাথরের মূর্তি। সমস্তই পালযুগের। আর বেশির ভাগই বুদ্ধ মূর্তি। পরে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ শালায়ও দেখেছেন আরো অনেক প্রাচীন মূর্তি; প্রায় সমস্তই পাল আমলের এবং বেশিরভাগই বুদ্ধ মূর্তি। (পৃষ্ঠা- ৩৩)। উল্লেখ্য, সোমপুর মহাবিহারটি পাল বংশের ২য় সম্রাট ধর্মপাল বর্তমান নওগাঁ জেলায় নির্মাণ করেছিলেন। (ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে)। আর যে বুদ্ধ মূর্তিগুলো অন্নদা শঙ্কর রায় দেখেছেন সেগুলো নিশ্চয়ই সোমপুর বিহার এবং অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের। ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার প্রায় ৭শ বছর পরও পথে ঘাটে যদি প্রচুর বুদ্ধ মূর্তি দেখা যায়, তাহলে অনুমান করা যায় ওই স্থানের লোকও নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিল।

সিলেট বৌদ্ধ সমিতি, সিলেট ২০০৫ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মৈত্রী' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। সেটার একটি কপি আমার কাছেও পাঠানো হয়। স্মরণিকায় সিলেট মদন মোহন কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ 'বৌদ্ধ-ইতিহাসের প্রত্ন স্মৃতি : ঐতিহ্য- অন্বেষার সোপান' শিরোনামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে বাংলাদেশে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের বিষয় নিয়ে লেখার সময় তিনি সিলেটে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কেও লেখেন। তবে তার প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশটি খুবই প্রণিধান যোগ্য।

'সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের শহীদ সোলায়মান হলের পেছনে রক্ষিত একাধিক শিলাখণ্ডের একটির এক পৃষ্ঠায় মুসলিম ক্যালিগ্রাফিতে আরবি ভাষায় কিছু কথা খোদাই করা আছে। কৌতূহলবশত এর বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখা যায় ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তির সুস্পষ্টচিহ্ন রয়েছে। অপর এক শিলাখণ্ডে একই প্রকার আরবি ভাষায় লেখা এবং এর অপর পৃষ্ঠায় প্রায় আড়াই ফুট দৈর্ঘ্য এবং দেড় ফুট প্রস্থ একটি বুদ্ধ মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়, যদিও উভয় শিলাখণ্ডের বুদ্ধ মূর্তিগুলো শক্ত ছেনি কিংবা হাতুড়ির আঘাতে নষ্ট করা হয়েছে। পাথর খণ্ড প্রত্যক্ষণের সময় নিবন্ধকারের সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত মনির উদ্দিন চৌধুরী (গ্রন্থাকারিক : কেমুসাস), অধ্যাপক নুরুজ্জামান মনি, শুভেন্দু ইমাম, ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক প্রমুখ। এই শিলা লেখা দুটি মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারক হলেও এর পেছনের বুদ্ধ মূর্তিগুলো এ অঞ্চলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্ন ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'

ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ আরো লেখেন, ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার কর্তৃক রচিত (সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ' গ্রন্থে মধ্যযুগে রচিত বজ্রযান মতের বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সাধনমালাতে ৪টি পীঠের নাম বলা হয়েছে– ওডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামাখ্যা এবং শিরিহট্ট (শ্রীহট্ট)। কাজেই আসাম এবং সিলেটে যে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধকদের আবাসভূমি ছিল, সেটা নির্দ্বিধায় বলা চলে। সে কারণেই হিউয়েন সাং

আসাম সফরে গিয়েছিলেন। তবে হিউয়েন সাং তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তখনকার সময়ের আসাম রাজা ভাস্করবর্মনের (৬৩০-৫০ খৃঃ) আমন্ত্রণে তিনি আসামে গিয়েছিলেন। তখন আসামের নাম ছিল কামরুপ।

আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে বৌদ্ধ ধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়– হীনযান এবং মহাযান। কিন্তু পরিবর্তনের শেষ দিকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে আবার কয়েকটি শাখা গড়ে ওঠে। যেমন মন্ত্রযান, সহজ-যান, কালচক্রযান ইত্যাদি। এভাবে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্মের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়ে কালক্রমে হিন্দু ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও বৌদ্ধ দেবদেবীর আগমন ঘটে এবং বৌদ্ধ ধর্ম এক নতুন ধর্মে পরিণত হয়। এই নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান দেবদেবী ছিলেন বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব এবং তাদের পত্নীগণ। ইহা ব্যতীত পিশাচী, মাতঙ্গী, ডাকিনী ইত্যাদি দেবীরও তন্ত্রযান শাখায় স্থান করে নিয়েছিল। বস্তুত অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা লাভ করাই উক্ত তন্ত্রযানের আসল উদ্দেশ্য। এসব বিভিন্ন যানে হিন্দু ধর্মের বহু আচার অনুষ্ঠান, রীতি নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে হিন্দুরা ভগবান বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নেয়। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ক্রমেই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একই রকম হয়ে যায়। কেবল নামেই বৌদ্ধ ধর্ম থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচরণ একই হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্মের দেবতাদের ন্যায় বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের পত্নীদেরও কল্পনা করা হয়েছে। ওই দেবীরা হলেন বজ্রধাত্রীশ্বরী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও তারা। দেবীরা ছিলেন দেবতাদের শক্তি বিশেষ। দেবতাদের কল্পনা করা হতো সুদূর এবং অজ্ঞেয় রূপে, দেবীদের সক্রিয়রূপে। দেবীদের সাহচর্য্য ব্যতীত দেবতাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত স্থানগুলো হলো নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং জগদ্দল মহা বিহার। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শান্ত রক্ষিত তন্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বজ্রযানের মাধ্যমেও কিছু হিন্দু দেবদেবীর মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন স্বরস্বতী, গজপতি, শিব বা মহাদেব ইত্যাদি। বস্তুত সকল প্রকার হিন্দু চিন্তা ধারাই বৌদ্ধ তন্ত্রে স্থান পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার উদ্দিনের মগধ (বিহার) এবং বাংলা দখলের পর মহাযানী বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে যায় এবং হিন্দু হয়ে যায়। ফলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ভারত বর্ষ হতে লুপ্ত হয়। আর হীনযানী বৌদ্ধরা যাদের সঙ্গে হিন্দুদের আচার আচরণে কোনো মিল নেই, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অভাবে মুসলমান হয়ে যায়। কারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে

জীবিতরা সবাই নেপাল, ভূটান, বার্মা ইত্যাদি দেশে চলে যায়।

ড. বিনয় তোষ ভট্টাচার্য্য এর মতে তৎকালে হিন্দু দেবতা ও বৌদ্ধ দেবতার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। হিন্দুরা বুদ্ধকে অষ্টম অবতার রূপে পূজা করতেন। মহাযান ধর্মে প্রধানত ভক্তিরই প্রাধান্য ছিল, যার কারণে পূজা, আরাধনা ও সেবার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হতো (বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্রবাদ, চারুলতা)।

আর বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, 'পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়ে সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৈরাগী ও বৈরাগিনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করলেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরো সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল। এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এতদূভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই প্রথমত বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদ করেন। (পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫, নির্বাচিত প্রবন্ধ আহমদ শরীফ)।

ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরো সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল। এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যিনি তন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের মূল্যোচ্ছেদ করেন। (পৃষ্ঠা-১৫৪-১৫৫) নির্বাচিত প্রবন্ধ আহমদ শরীফ, আগামী প্রকাশনী।

আর পূর্ব ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির ব্যাপারে সৈয়দ আলী আহসান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'চর্য্যাগীতিকায়' নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। 'বৌদ্ধ দেবী ও দেবতাদের নামে কত ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির তৈরি হয়েছিল, যে মন্দিরগুলো ছিল প্রভূত স্বর্ণ মনি মুক্তার ভাণ্ডার। এভাবে লোকেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে হাজার হাজার বছর ধরে অপার সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। এ সমস্ত সম্পদের প্রলোভনে সুলতান মাহমুদ এবং বখতিয়ার খিলজী ভারতের বিভিন্ন মঠ এবং মন্দির আক্রমণ করেন এবং মঠ মন্দিরের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করেন। এদের আক্রমণের ফলে বিশেষ

করে ত্রয়োদশ শতকে বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার আর জায়গা রইল না। তাদের না রইল কোনো বিহার, না রইল কোনো সংরক্ষক ও পোষক। সাধারণ জনতার বিশ্বাসও পূর্বের মতো রইলো না। তাই তারা ভারত থেকে যাত্রা করলেন। এভাবে উত্তরে তিব্বত, পূর্বে বার্মা এবং চীন এবং দক্ষিণে সিংহলে তারা স্বাগত হলেন। ভিক্ষুদের অভাবে গৃহী বৌদ্ধরা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে নালন্দা ও বিক্রমশীলা থেকে বৌদ্ধরা নিঃশেষ হয়ে গেল। (পৃষ্ঠা-৬)।

সৈয়দ আলী আহসান আরো লিখেছেন, 'এই সিদ্ধ যোগীদের তন্ত্র সাধনা ও চিন্তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বহু সময় পর্যন্ত চালু ছিল। মুসলমান আগমনের পর বিশেষ করে পাঠান আমলে এরা ক্রমশঃ বিহার, বাংলাদেশ, উড়িশ্যা, আসাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এদের অবস্থান ছিল বিহারের নালন্দার বিক্রমশীল নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠে। বখতিয়ার খিলজী নালন্দা ও বিক্রমশীল এই দুই অঞ্চলকে দখল করেন। দখল করার পর এই সাধকগণ বিহার বাংলাদেশ ত্যাগ করে উত্তরাঞ্চলের দিকে চলে যান এবং এদের অনেকে অধিকাংশ বলা যায় তিব্বতের ভোট অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। তাই তিব্বতের ভোট অঞ্চল থেকে এবং নেপাল অঞ্চল থেকে চর্য্যাগীতিকাগুলো আবিস্কৃত হয় (পৃষ্ঠা ৪০)।

উল্লেখ্য, সেনরা পালদের নিকট হতে বাংলাদেশ দখল করলেও বখতিয়ার খিলজী যখন মগধ (বিহার) আক্রমণ করেন, তখনও পাল রাজবংশের একটি শাখা সেখানে রাজত্ব করতেন। পাল আমলে (৭৫০-১১২৪ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ছিল। সেনযুগে (১১২৪-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হলেও বাংলার অধিকাংশ লোক তখনও বৌদ্ধ ছিল।

পূর্ব ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির প্রায় ১শ বছর পরে দক্ষিণ ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়। তবে বর্তমান স্বাধীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে দলিত জনগণের নেতা ড. আম্বেদ করের নেতৃত্বে ভারতের কয়েক লক্ষ দলিত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে পর এখন ভারতের বৌদ্ধদের সংখ্যা ১ কোটির বেশি। এখন প্রতি বছর হাজার হাজার দলিত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে থাকে।

বৌদ্ধগণ বিশেষ করে হীনযানী বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণের ফলে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দেয়। বৌদ্ধ ধর্ম হতে দীক্ষিত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি আচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত নতুন আঙ্গিকে বজায় রেখেছে। তারা পূর্বেকার দৃঢ়মূল বিশ্বাস, সংস্কার, আচারের প্রভাব এড়াতে পারেনি। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ওসকার ভন হিনুবারের মতে প্রাচীন ভারত ও মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ Monastic Schools গুলোর অনুকরণে পরবর্তীকালে মুসলমানরা মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলন

করে। এখনও তিব্বত এবং ভূটানে আমাদের দেশের মাদ্রাসার ন্যায় Monastic Schools রয়েছে। ভারতের বাঙ্গালোর শহরে তিব্বতীরা একটি বড় Monastic School প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম ধর্মে কোনো পীরবাদ বা গুরুবাদ নেই। পবিত্র ইসলামে আছে স্রষ্টা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি। মহান আল্লাহ হলেন স্রষ্টা এবং দুনিয়ার সবকিছু তার সৃষ্টি। আর মানুষ হলো আল্লাহর সৃষ্ট সেরা জীব। আর মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হলেন তার শেষ পয়গম্বর। সৌদি আরব অথবা অন্য কোনো দেশে পীরবাদ নেই। বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী আহমদ শরীফের মতে ইসলামে পীরবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মের স্থবিরবাদ একই (পৃষ্ঠা-১৪৯, নির্বাচিত প্রবন্ধ আহমদ শরীফ)। মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করার পর আরব, মধ্য এশিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ হতে আগত ইসলাম প্রচারকগণ পরবর্তীকালে পীর, আউলিয়া, দরবেশ নামে পরিচিতি লাভ করেন। উল্লেখ্য, থেরবাদী ভিক্ষুরা স্থবির এবং মহাযানী ভিক্ষুরা রাউলি বলে তখন পরিচিত ছিলেন এবং এখনও তাই আছেন। স্থবির এর প্রতিশব্দ হলো পীর, যেটা ফারসি শব্দ। আর আওলিয়া হচ্ছে আরবি শব্দ, আর দরবেশ এর ফারসি প্রতিশব্দ। থেরবাদ ও পীর বা গুরুবাদ অভিন্ন। এদেশে গুরুবাদটা জৈন ও বৌদ্ধ অবদান। (পৃষ্ঠা ১৪৯, নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ)।

সৌদি আরবে এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মিলাদ নামে কোনো অনুষ্ঠান নেই। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানেরা 'মিলাদ' নামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। সাধারণত নিজ বাড়িতে অথবা মসজিদে কোনো বিশেষ উপলক্ষ যেমন কারোর মৃত্যুর পর, কোনো অশুভ পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে, বন্যা, খরা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে, কোনো শুভ কাজ শুরু উপলক্ষে, কোনো গৃহ অথবা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে, নবজাতকের জন্মের পর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মিলাদ অনুষ্ঠানটি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন মৌলভী ডাকা হয় অথবা নিয়োগ করা হয়। এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও নিকট-আত্মীয়দের আমন্ত্রণ করা হয়। মৌলভী সমবেত লোকজনসহ ধর্মীয় মন্ত্রপাত ও অন্যান্য আচরণাদি সম্পন্নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত লোকদের গৃহস্থের সামর্থ্য অনুযায়ী আপ্যায়ন করা হয়। মৌলভীকেও কিছু টাকা-পয়সা দেয়া হয়।

উপমহাদেশে হীনযানী অথবা থেরবাদী বৌদ্ধরাও বাড়িতে কোনো শুভ ঘটনা যেমন নবজাতকের জন্ম, নতুন বাড়ি উদ্বোধন ইত্যাদি এবং অশুভ ঘটনা বাড়ির কারোর মৃত্যু অথবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটার পর অথবা বাড়ির সবাইর মঙ্গল কামনায়, বাড়ি হতে অশুভ শক্তিকে তাড়াবার জন্য অথবা অশুভ শক্তির হাত হতে মুক্তির জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যা ভিক্ষুদের নিকট হতে 'মঙ্গলসূত্র' মন্ত্রপাত গ্রহণ নামে পরিচিত। এক বা একাধিক ভিক্ষুকে বাড়িতে ডেকে

এনে এবং নিকট-আত্মীয় ও পাড়াপড়শীদের আমন্ত্রণ করে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এটি একটি মঙ্গল আচরণ অনুষ্ঠান বাড়ির লোকদের মঙ্গলের জন্য করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুরা ধর্মীয় 'মঙ্গলসূত্র' মন্ত্রপাত করেন এবং আরো কতিপয় আচরণাদি সম্পন্ন করে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়। তারপর ভিক্ষুদের এবং উপস্থিত সকলকে আপ্যায়নের মাধ্যমে বিদায় দেয়া হয়। ভিক্ষুদের কিছু দান দক্ষিণাও দেওয়া হয়।

বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী ড. আহমদ শরীফের মতে, তৎকালীন থেরবাদী বৌদ্ধরা ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার পর পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য অনুসরণ করে 'মিলাদ' অনুষ্ঠানটি চালু করেছিল। অর্থাৎ থেরবাদী বৌদ্ধদের 'মঙ্গল সূত্র' মন্ত্রপাত অনুষ্ঠানটি পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে মুসলমানদের জন্য মিলাদ হয়ে যায়। উভয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ একই। ধর্মের ভিন্নতার কারণে এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধাণের কারণে আচরণে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা নেড়া মাথায় থাকেন। বৌদ্ধ হতে মুসলমান হয়েছিল বিধায় তখন এবং পরবর্তীকালে মুসলমানদের নেড়ানেড়ী বলে বিদ্রূপ করা হত। তখনকার সামাজিক ইতিহাস পাঠ করলে বিষয়টি জানা যায়।

ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাকে দাহ করা হয়। দাহ করার পর যে দেহাবশেষ থাকে, সেসব তার শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। শিষ্যরা নিজ নিজ ভাগের অংশগুলো খুবই পবিত্র মনে করে নিজ নিজ স্থানে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চৈত্য অথবা স্তূপ নির্মাণ করে প্রোথিত করে রাখেন এবং বিশেষ সময়ে সেসব স্থানে শ্রদ্ধা জানাতে যান। পরবর্তীতে তাদের শিষ্যরা এবং অন্য বৌদ্ধরাও সেইসব চৈত্যে/স্তূপে শ্রদ্ধা জানাতে যেতে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে চৈত্যের সৃষ্টি হয়। একইভাবে বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণের পর পীর দরবেশদের কবরস্থান 'পূত পবিত্র মনে করে সেইসব স্থানে বিশেষ বিশেষ দিবসে মোনাজাত করা শুরু করে। এভাবে আমাদের দেশে কবর জিয়ারত, ওরস ইত্যাদি পালন শুরু হয়। সৌদি আরব এবং অন্যান্য আরব দেশে কবর জিয়ারতের কোন প্রথা নেই।

বিখ্যাত পণ্ডিত এইচ. এ. আর গিব এর মতে সুফিবাদটি বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মতবাদ দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। কারণ সুফীবাদ তথা মরমীবাদ অনারব এবং অনৈসলামিক মননজাত ও জীবনচর্চা। একই ধারণা পোষণ করেন বিখ্যাত পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ। তার মতে বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট এবং ব্রাহ্মণ্য উপনিষদের প্রভাবে সুফী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে মিশরে, ইরাকে এবং মধ্য এশিয়ায়। সুফী মাত্রই পীর মুর্শিদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধি লাভের একমাত্র পথ। এটি পরিণামে কবর পূজার ও (দরগাহ, বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্তূপ পূজার মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল (পৃষ্ঠা- ২৫১, ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা আহমদ শরীফ)।

হাজার বছরের বেশি আগে বৌদ্ধধর্ম আফগানিস্তান হতে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও আফগানিস্তানের বামিয়ান পাহাড়ের গায়ে দু'টি বিরাট উঁচু বুদ্ধমূর্তি ছিল। এর একটির উচ্চতা ছিল ৫০ মিটার এবং অপরটির উচ্চতা ছিল এর চেয়ে কিছুটা কম ৩৪.৫ মিটার। তালেবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের পর ২০০১ সালে ঐ দু'টি বুদ্ধমূর্তিসহ শ' শ' প্রাচীন ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ স্থাপত্য বিস্ফোরক এবং অন্যভাবে ধ্বংস করে দেয়। প্রায় দুই হাজার বছর আগে এবং পরে বর্তমান পাকিস্তান ও ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তখন বর্তমান পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত গান্ধারা সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান পাকিস্তান এর সোয়াতের অধিবাসী গুরু পদ্ম সম্ভবা (৭১৭-৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ) তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে যান। এবং সেখান হতে ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভুটানে যান। সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন তখন ভূটানে লোকজন এক ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করতো, যা বোন ধর্ম নামে পরিচিত ছিল। ভুটানে তিনি এখনও গুরু রিম্পোচী নামে পরিচিত। ভুটানে তিনি এখন ভগবান বুদ্ধের পরে সবচেয়ে পূজনীয় ব্যক্তি। প্রায় হাজার বছরের অধিক পূর্বে পাকিস্তান হতে বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদ হয়ে গেলেও এখনও সে দেশের বহু জায়গায় বৌদ্ধ যুগের বহু relics এবং অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। এখন বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে সেই relics এবং অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নগুলো ধ্বংস করার প্রয়াস চলছে। গত ১৩-৯-২০০৭ সালের করাচীর দৈনিক The Dawn পত্রিকায় নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় লিখে এর প্রতিবাদ করা হয়।

Protecting pre Islamic relics

The attempt by Islamist militants to blow up the historical Buddha Statue near Mingora in Swat reminds one of the madness the Tiliban Government of Afghanistan had wrought at Bamian in 2001. This particular relics belonging to the Gandhara era (400Bc-200AD) is not only a national treasure but also a world heritage that the entire humanity shares. It was by sheer luck that the statue remained intact in the attack even though the explosion managed to bring down a sizable portion of the rock. This should serve as a wake up call for the authorities concerned, for there are hundreds of such statues and other Buddhist era relics spread across much of the Frontier and the tribal areas bordering Afghanistan, where religious extremists of the most morbid men-

tality now hold sway. With its ancient capitals at Taxila and Pushkalawati (present day Peshowar), Gandhara civilisations relics adorn the entire region. These include ruins of monastaeries, castles, stupas, original and votive (those built offerings at shrine by rich pilgrims) and hundreds of statues. Some of the last mentioned continue to be present to this day, albeit in their faded glory, at the original historical sites where they were placed, while many others have been shifted to museums around the country. The latest attempt to destroy the Swat Buddha statue calls for stricter vigilance of such sites everywhere. The Butkarra ruins in near by Saidu Sharif, the city's museum, the Gandhara museum and the Takht I Bahi ruins are particularly vulnerable and must be protected from any possible targeting by the misguided zealots. The obliteration of history to serve the cause of bigotry must be condemned at the official level and meaningful efforts made to secure all such endangered sentinels of a heritage built on tolerance and respect for a shared past.

বহু শত বছর পূর্বে বাংলার বৌদ্ধরা মুসলমান হলেও প্রথম দিকে তারা ছিল নামে মাত্র মুসলমান। তারা ইসলাম ধর্মের তেমন কিছু জানত না। তারা পীর পূজা করত, নানা রকম ঐহিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানত করত। কিন্তু ঐসব ইসলামে নিষিদ্ধ। তখন মুসলমানরা নামই রাখত আগের মত যেমন বলাই, কানাই, প্রভাত মণ্ডল, নারায়ণ তরফদার, মঙ্গলু, লেদু তরফদার ইত্যাদি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাদের পরিধেয় ছিল ধূতি, আর কাঁধে ছিল গামছা। তারা দাঁড়িও রাখত না। কাজেই বাহ্যিকভাবে কে মুসলমান কে হিন্দু বোঝা যেত না। কয়েকশ' বছর যাবৎ এরকমই চলছিল, প্রত্যেকেই যার যার ধর্ম নিজের মতো করে পালন করতো। কেউ বাধা দিত না। গ্রামে ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। পরবর্তীতে সেটার আস্তে আস্তে পরিবর্তন শুরু হয়, যখন এদেশ হতে যারা মক্কা শরীফে হজ করতে যায় তাদের দ্বারা। দেশে ফিরে তারা আরবীয় নিয়মে দাঁড়ি রাখা এবং অন্যান্য ইসলামী নিয়ম কানুন এবং আচার আচরণ কঠোরভাবে পালন করতে থাকে। তখন তারা এবং তাদের অনুকরণে আরো কিছু কিছু মুসলমান দাঁড়ি রাখা এবং ধূতিকে লুঙ্গির মতো করে পরিধান করত। এবং নিজেদের এবং ছেলেমেয়েদের নাম আরবি, ফার্সি ধরনের নাম রাখত। তবে এসব বিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন তিতুমীর (১৪৭২-১৮৩১) এবং হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)।

তিতুমীরের আসল নাম হল স্যায়িদ মীর নাসির আলী। তিনি বর্তমান পশ্চিম

বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মীর হাসান আলী এবং মায়ের নাম ছিল আবিদা রোকেয়া খাতুন। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন এবং কুরআনে হাফিজ হন। তিনি ১৮২১ সালে হজব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফ যান এবং সেখানে সায়ীদ আহমদ বেরেলভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮২৭ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে আরবি ফারসি নাম রাখতে এবং দাড়ি রাখতে প্রচার চালাতে থাকেন। এতে কিছু মুসলমান আপত্তি জানায়। তারা স্থানীয় জমিদারদের কাছে নালিশ জানাতে থাকে। কারণ তখন মুসলমানদের দাড়ি রাখার নিয়ম ছিল না। তখন পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তার জমিদারি এলাকায় দাঁড়ি রাখলে আড়াই টাকা ট্যাক্স ধার্য করে দেন। এতে তিতুমীর এবং তার সাগরেদরা ক্ষিপ্ত হয়ে যান। কারণ দাড়ি মুসলমানদের একটি প্রধান ঐতিহ্য। এতে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের কয়েকবার সংঘর্ষও বাধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিতুমীরেরই জয় হয়। এবং লোকজন ইসলামী আদর্শের দিকে আরো বেশি আকৃষ্ট হয়। তারা তাদের জীবনযাপন ও ইসলামের অনুশাসন মোতাবেক পরিচালনা করতে থাকে। তারা তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের নামধাম ও আরবদের অনুকরণে রাখা শুরু করে। আর হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মাদারীপুর মহাকুমার শ্যামাইল গ্রামে। বর্তমান শরীয়তপুর জেলার নাম হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামেই হয়েছে। ১৭৯৯ সালে মক্কা গমন করেন। সেখানে তিনি তৎকালীন মক্কার বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে ধর্ম শিক্ষা ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফেরত আসেন এবং দেশে কিছুদিন থাকার পর তিনি আবার মক্কায় যান এবং ১৮২০ সালে দেশে আবার ফেরত আসেন। দেশে তিনি এখন ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন, যেটা শেষ পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে আর যারা তার সংস্কারগুলো গ্রহণ করত তাদের ফরাজী বলা হতো।। যেগুলো ইসলামে ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় সেগুলো পালনের জন্য শরীয়তউল্লাহ লোকজনকে বুঝাতে থাকেন। তার আন্দোলনের ফলে বাংলার মুসলমানরা অমুসলিম প্রতিবেশীদের প্রথা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে জীবনযাপন শুরু করে। ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মারা যান এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র হাজী দুদু মিঞা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়া ও বহু নামে মাত্র মুসলমান পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে ইসলামী নিয়ম-কানুন আচার-আচরণ শিখে দেশে ফেরত আসেন এবং দেশে ফেরত এসে অন্যদের ও তাদের মতো

আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবেই বাংলার মুসলমানরা কেবল নাম নয় আচার-আচরণে, ব্যবহারেও মুসলমান হয়ে যায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ তার আত্মজীবনী 'আত্মকথায়' লেখেন তার প্রপিতামহ আছারউদ্দিন ফরাজী হইবার পূর্বে (হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারের অনুসারীদের ফরাজী বলা হতো) তাদের পারিবারিক পদবি ছিল মাদারী। তার বাবার (আছার উদ্দিন এর) নাম ছিল ফালু মাদারী। ফালু মাদারীর বাবার নাম ছিল কালু মাদারী, তার বাপ ছিলেন ছাবু মাদারী এবং তার বাবার নাম লেদু মাদারী (পৃষ্ঠা ২১)। তিনি আরো লেখেন তিনি তার দাদাজী এবং তার সমবয়সীদের মুখে শুনেছেন তৎকালে নামাজ রোজা খুব চালু ছিল না। ওয়াকতিয়া ও জুমার নামাজ বড় কেউ পড়ত না। এ অঞ্চলে কোন মসজিদ ও জুমার ঘর ছিল না। বছরে দুইবার ঈদের জামাত হইত বটে; কিন্তু তাতে বড়রাই শামিল হইত। কাজেই জামাতে খুবই অল্প লোক হইত। ঈদের মাঠে লোক না হইলেও বাড়ি বাড়ি আমোদ সামুদ হইত খুব। সাধ্য মত নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকেরা বেদম গান-বাজনা করিত। সারারাত ঢোলের আওয়াজ পাওয়া যাইত। প্রায়ই বাড় বাড়ি ঢোল-ডগর দেখা যাইত। বকরা ঈদে গরু কোরবানি কেউ করিত না। কারণ জমিদারের তরফ হইতে উহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খাসি বকরি কোরবানি চলিত। লোকেরা করিতও প্রচুর। তরুণদের তো কথাই নাই, বয়স্কদেরও সকলে রোজা রাখিত না। যারা রোজা রাখিত, তারাও দিনের বেলা পান ও তামাক খাইত। শুধু ভাত খাওয়া হতে বিরত থাকিত। পানি ও তামাক খাওয়াতে রোজা নষ্ট হইত না এই বিশ্বাস তাদের ছিল। কারণ পানি ও তামাক খাইবার সময় তারা রোজাটা একটি চোংগার মধ্যে ভরিয়া রাখিত। কায়দাটা ছিল এই : একদিকে গিরোওয়ালা মোটা বরাক বাঁশের দুই একটা চোংগা সব গৃহস্থের বাড়িতে আজও আছে, আগেও থাকিত। তাতে সারা বছর পুরুষরা তামাক রাখে। মেয়েরা রাখে লবণ, সজ, গরম মশলা, লাউ কুমড়ার বিচি ইত্যাদি। আগের কালে এ রকম চোংগার অতিরিক্ত দুই একটা বাড়ি বাড়িই থাকিত। রোজার মাসে মাঠে যাইবার সময় এই রকম এক একটা চোংগা রোজাদাররা সঙ্গে রাখিত। পানি তামাকের শখ হইলে এই চোংগার খোলামুখে মুখ লাগাইয়া খুব জোরে দম ছাড়া হইত। মুখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি গামছা, নেকড়া বা পাটের ঢিপলা দিয়া চোংগার মুখ কষিয়া বন্ধ করা হইত যাতে বাতাস বাহির হইয়া না আসে। তারপর আবশ্যক মত পানি তামাক খাইয়া চোংগাটি আবার মুখের কাছে ধরা হইত। খুব ক্ষিপ্র হস্তে চোংগার ঢিপলাটা খুলিয়া মুখ লাগাইয়া মুখে চুষিয়া চোংগার বন্ধ রোজা মুখে আনা হইত এবং ঢোক গিলিয়া একেবারে পেটের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত। খুব ধার্মিক ভাল মানুষ দু'একজন এমন করাটা পছন্দ

করিতেন না বটে, কিন্তু সাধারণভাবে এটাই চালু ছিল (পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। আছরউদ্দিন ফরাজী ও তার তিনজন সাথী শরা কবুল করার পরেও জনসাধারণের মধ্যে বহুকাল যাবৎ ঐ আচার প্রচলিত ছিল। ঐ চারিবন্ধুর প্রচারেই ক্রমে ক্রমে আরো অনেক লোক শরা কবুল করেছিলেন বটে, কিন্তু সারা গ্রামবাসীর তুলনায় তারা ছিলেন নগণ্য মাইনরিটি। আবুল মনসুর আহমদ আরো লিখেন, 'তৎকালে তহবন্দ পরা খুবই শরমের ব্যাপার ছিল। সবাই কাছাদিয়া কাপড় পরিত। শরা জারির আগে তো বটেই, শরা জারির পরেও এটা চালু ছিল'। ঈদের জামাতেও লোকেরা কাছা দিয়া ধূতি পরিয়াই যাইত। নামাজের সময় কাছা খুলিতেই হইত। সে কাজটাও নামাজে দাঁড়াইবার আগে তক্ করিত না। প্রথম প্রথম নামাজের কাতারে বসিবার পর অন্যের অগোচরে চুপি চুপি কাছা খুলিয়া নামাজ শেষ করিয়া কাতার হইতে উঠিবার আগেই আবার কাছা দিয়া ফেলিত। শরম কাটিবার পর অবশ্য নামাজের কাতারে বসিবার আগে তো বটেই, ওযু করিবার আগেই কাছা খুলা চালু হইয়াছিল। ... সাদা লুঙ্গিকেই আগে তহবন্দ বলা হইত। দাদাজীর আমলে রঙিন লুঙ্গি কেউ দেখেন নাই। রঙিন লুঙ্গির প্রথম প্রচলন হয় বার্মা হইতে। লুঙ্গির প্রচলন হওয়ার আগে পর্যন্ত সকলেই তহবন্দ পরিত। সাড়ে চার হাত লম্বা মার্কিন (অধুলাই লংক্লথ) বা নয়ান সুখ (ধোলাই লংক্লথ) কাপড়ের দুই মাথা একত্র জুড়িয়া সিলাই করিলেই তহবন্দ হইত। (পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

আবুল মনসুর আহমদ আরো লিখেন, 'শরা জারি হইবার আগে আমাদের অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা, গোরপূজা ইত্যাদি যেসব বেশরা প্রথা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে 'মাদার পূজা' ছিল প্রধান। এবং এটা ছিল বার্ষিক মচ্ছব। হিন্দুদের 'মহোৎসবেরই এটা অপভ্রংশ নিশ্চয়'। পূজা কথাটাও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কালু গাযীর মতো মাদার গাযী ও মুসলমানদের কিংবদন্তীর 'হিরো' ছিলেন। তবে মাদার পূজা বা কোনও পূজাতেই কোনও মূর্তিপূজা হইত না। প্রতিবছর ধান মাড়াই হইবার পরই সাধারণত মাঘ মাসে এই মাদার পূজার মচ্ছব হইত। খুব লম্বা সোজা একটা আস্ত বাঁশ খাড়া করিয়া গাড়া হইত। বাঁশটির আগাগোড়া নিপিস করিয়া চাঁছিয়া-ছুলিয়া সুন্দর করা হইত। শুধু আগার দু'একটা কঞ্চি পাতা শুদ্ধা রাখিয়া দেওয়া হইত। ঐ কঞ্চির নিচেই একগোছা পাট বাঁধা হইত। এই পাটের গোছাটি কোনও বছর মেজেন্টর লাগাইয়া লাল রং করা হইত। কোনও বছর নীল লাগাইয়া নীল রং করা হইত। এই রং বদলানোর কোনও ধর্মীয় কারণ ছিল, না একটার অভাবে আরেকটা লাগান হইত, দাদাজী তা বলিতে পারিতেন না। যাহোক বাঁশের আগায় ঐ লাল নীল রঙের এক গোছা পাট ঝুলান হইত। এবং বাঁশটির আগাগোড়া চুন হলুদ ও গোড়ায় হলুদ ও সিন্দুরের ফোটা দেওয়া হইত। বাঁশের গোড়ায় অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া উঁচা

ভিটি বানান হইত এবং তা লিপিয়া পুছিয়া ফিটফাট করা হইত। তিন দিন ধরিয়া এই বাঁশটি খাঁড়া থাকিত। এই তিন দিন ধরিয়াই বাঁশ ঘিরিয়া ঢাল তলোয়ারসহ নাচিয়া কুদিয়া ঢোল-ডগর যোগে মাদারের গান, গাযীর গান ও জারি গান গাওয়া হইত। এই তিন দিনই বিশেষত প্রথম দিন এই বাঁশের চারদিক মেলা বসিত। মেলায় অনেক জিনিস বিকিকিনি হইত।

মাদার পূজার পুরোহিতকে মাদারী বলা হইত। তিনি ছিলেন গ্রামের ধর্মীয় গুরু। তিনি ছুঁইয়া না দেওয়া পর্যন্ত বাঁশ খাড়া হইত না। তিনি আবার ছুঁইয়া না দেওয়া পর্যন্ত বাঁশ নামান হইত না। মাদার বাঁশ খাঁড়া করিবার পর মাদারী সাহেব বাঁশের গোড়ায় ভিটিতে লাল রঙের নয়া গামছা পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। দর্শকরা সেই গামছায় যার তার নযর দিতেন। তৎকালে টাকা আধুলির প্রচলন খুব কমই ছিল। অধিকাংশেই কড়ি, আধলা, পয়সা, ডবল পয়সাও বড় জোর আনি-দুয়ানি ব্যবহার করিত। মাদারীর নযরেও কাজেই তাই ফেলিত। কিন্তু ঐ রূপে যে পয়সা জমা হইত, তাতেই মাদারী সাহেবের সম্বৎসর চলিয়া যাইত। (পৃষ্ঠা ২১-২২)।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ একসময় মহাযানী বৌদ্ধ ছিল। ছোটবেলায় আমি গ্রামে গ্রামে মহাযানী ভিক্ষু রাউলী দেখেছি। এখনও নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাউলী ভিক্ষু দেখা যায়। তখন চাকমারা স্বরস্বতী, কালী এবং হিন্দুদের আরো কিছু দেব দেবীর পূজা করত। রোগ বালাই হতে মুক্তির জন্য পশুবলিও দিত। ১৯৫৩-৫৫ সালে আমি কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে পড়েছি। তখন কলেজের কিছু দূরে আমুচিয়া নামক এক বড়ুয়া গ্রামে দ্বিজেন বড়ুয়া নামে এক বৌদ্ধের বাড়িতে Paying guest ছিলাম। তখন জেনেছি অনেক বছর পূর্বে বড়ুয়া বৌদ্ধরাও কালী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতীর পূজা করতেন। পশু বলি প্রথা ও বড়ুয়া সমাজে ছিল। গ্রামের বৃদ্ধরা এসব কথা কথা বলতেন। তারা নিজেরাও নাকি করতেন।

১৮৫৬ সালে আরাকান হতে মহাপণ্ডিত থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে আসেন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অসারতা ও থেরবাদী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকেন। ওই সময় চাকমা রানী (১৮৪৪-১৮৭৩) –কালিন্দীর আমন্ত্রণে তিনি বর্তমান রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত রাজানগরের রাজদরবারে যান। রানী কালিন্দী তার ধর্মোপোদেশ শুনে খুবই অভিভূত হন এবং থেরবাদী মতবাদে দীক্ষিত হন। তিনি তার রাজধানী রাজানগরে 'মহামুনি' নামে একটি বৌদ্ধ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ মন্দিরটি এখনও রয়েছে। এরপর রানীর প্রজা অনেকে চাকমা, বড়ুয়া, মার্মা থেরবাদী মতবাদ গ্রহণ করে। তখন মহাযানী ভিক্ষুদের বলা হতো রাউলি বা রুলি এবং ঠাউর বা ঠাকুর। তাদের অনেকেই সংসারী ছিলেন। ১৮৬৪ সালে ৭ জন মহাযানী ভিক্ষু সারমেধ

মহাস্থবিরের নিকট উপ-সম্পদা গ্রহণ করেন। এভাবে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে থেরবাদ মতবাদ প্রচার শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণ শুরু হয়, 'রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরোর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) বার্মা হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আসার পর হতে। তিনি ছিলেন পালি ও ত্রিপিটক বিশারদ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি চাকমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ আগরতারা বাংলায় অনুবাদ করেন। উল্লেখ্য, আগর তারা হলো বিকৃত পালি, প্রাকৃত এবং চাকমা ভাষার সমন্বয়ে রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা তিনি ধর্মের প্রতি লোকজনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ হয় সাধক বনভান্তে সাধনানন্দ মহাস্থবিরের ধর্ম দেশনা দ্বারা। সাধারণ বৌদ্ধ জনগণ ভান্তের আচার-আচরণ এবং ধর্মদেশনা দ্বারা বিমোহিত হয়। এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের প্রায় বৌদ্ধ গ্রামে বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এবং তারা সবাই থেরবাদী বৌদ্ধ। আর বনভান্তে হলেন একজন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। এর কিছুকাল পর হতে জঙ্গলে যেয়ে গাছের নিচে ধ্যান করা শুরু করেন। ১৯৬১ সালে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বনভান্তে কোনোদিন লোকালয়ের বৌদ্ধ বিহারে বাস করেন না। তিনি জঙ্গলেই থাকেন এবং সেখানেই গ্রামবাসীরা তার জন্য একটি ছোট্ট বিহার নির্মাণ করে দেয়। সেজন্য তিনি বনভান্তে নামে পরিচিত। তিনি বিছানায় শুয়ে ঘুমান না। তার আসনে বসে ধ্যান করতে করতে তার যা ঘুম হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি রাঙ্গামাটি শহরের কাছে রাজবন বিহারে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি দেশের লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ জনগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

পরিশেষে ত্রিপিটকের সংযুক্ত নিকায়ের The Buddhist Doctrine of Life after Death হতে একটি সূত্র এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক এবং এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজলের মানবপুত্র-বুদ্ধ নামক গ্রন্থ হতে তিনটি নিবন্ধ সংযোগ করে দিয়ে রচনাটি শেষ করলাম।

'According to the seed that's sown
So is the fruit ye reap there from.
The doer of good will gather good,
The doer of evil, evil reaps
Sown is the seed and planted well.
Thou shalt enjoy the fruit thereof.'
(ত্রিপিটকের সংযুক্ত নিকয়ের সূত্র ২২৭ এর ইংরেজি অনুবাদ)

বুদ্ধের জীবন-দর্শন

আবুল ফজল

মানুষের ইতিহাস সুদীর্ঘ-এ দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষের জীবন আর জীবনের পরিণতি, তার ইহ-পরকাল আর সুখশান্তির ভাবনা-চিন্তায় যে গুটিকয়েক মহামানব জীবন উৎসর্গ করেছেন তার মধ্যে মহাপুরুষ বুদ্ধ শুধু অন্যতম নন– এক অনন্য আসনেরও তিনি অধিকারী। অন্যান্য বৃহৎ ধর্ম-প্রবর্তক ও প্রচারকেরা প্রায়ই সবাই ছিলেন প্রেরিত পুরুষ– অন্তত তাই তারা বলে গেছেন। তাদের বাণী ঈশ্বরের বাণী, তাদের শিক্ষা ঈশ্বর-নির্দেশিত ও ঈশ্বর-আদিষ্ট। তারা সর্বতোভাবে ঈশ্বরের মুখপাত্র ও তারই প্রতিনিধি ও দূত। এমনকি কেউ কেউ ঈশ্বরপুত্র বা অবতাররূপেও হয়েছেন চিত্রিত ও বর্ণিত। অনুরক্ত ভক্তদের কাছে এসব অভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিণত। আর ওইসব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের একাধিক বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায় ও সেসব সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন আচার-আচরণ।

বুদ্ধ নিজে তেমন কোন দাবি করেননি– কোন রকম অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিত বা নির্দেশে তিনি নতুন কোন ধর্ম-প্রচারে হননি ব্রতী। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই তিনি লাভ করেছেন তার ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা। তার সব রকম প্রজ্ঞা আর পরিণামে বুদ্ধত্বলাভও এ অভিজ্ঞতার পথেই হয়েছে আয়ত্ত। কোন রকম অপৌরুষেয় শক্তির সহায়তা ছাড়াই তিনি পৌঁছেছেন প্রজ্ঞা পারমিতায়– সিদ্ধিলাভ করেছেন স্রেফ জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধ্যান আর সাধনায় রূপান্তরিত করেই। এদিক দিয়েও তার সাধনা ও মনীষা মানুষের জন্য এক বিরাট বিজয়। মানুষের অভ্যন্তরে এক অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে, আর নিজের সাধনা আর তপস্যায় মানুষ যে কত উঁচুতে উঠে যেতে পারে, তার এক সাক্ষাৎ নিদর্শন মহামানব বুদ্ধের জীবন। তিনি নির্ভর করেননি কোন অলৌকিক শক্তির উপর– তুলে ধরেননি মানুষের সামনে অপার্থিব কোন আশা-আশ্বাস বা ভয়ভীতি কি প্রলোভন। তাই তাঁর ধর্ম-দর্শনে ঈশ্বর যেমন অনুপস্থিত, স্বর্গ-নরকও

তেমনি গৌণ। বৌদ্ধধর্মের এ এক বড় বৈশিষ্ট্য– অন্য ধর্মের সাথে এখানেও রয়েছে ধর্ম-দর্শনে তার বিরাট পার্থক্য। সজ্জীবন যাপন আর সদাচরণই বুদ্ধের শিক্ষা– তাহলেই লাভ হবে মোক্ষ বা নির্বাণ। নির্বাণ মানে বার বার জন্মে জীবনযন্ত্রণা থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করা। জন্মান্তর দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তাই আমাদের বোধগম্যও নয় তা। মনে হয় এটি হিন্দু দর্শনেরই সহোদর– অন্তত তারই বর্ধিত রূপ।

বুদ্ধের এক বড় বৈশিষ্ট্য বাস্তববোধ। নিজের জীবনের চারপাশে বুদ্ধ জীবনের বহুবিধ যন্ত্রণা দেখেছেন– যা দেখে তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন। শেষে গৃহ-সংসার সুখ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এ জীবন-যন্ত্রণা থেকেই তিনি পৌঁছেছেন জীবনপ্রীতিতে। এ জীবন-প্রীতিরই সাক্ষাৎ ফল অহিংসা বা সর্বজীবে প্রেম। বলাবাহুল্য জীবন-যন্ত্রণা সব মহাভাবেরই উৎসমুখ। এমনকি মহৎ শিল্পকর্মেরও। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের উৎপত্তিও এভাবেই ঘটেছে। চারদিকে জীবন-যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই আবির্ভাব ঘটে তার ত্রাতারও। তাই যুগাতীত হয়েও মহাপুরুষরাও যুগ-সন্তান। তাদের জীবন-দর্শনে আর ধর্ম- দেশনায়ও তাই যুগ-পরিবেশ তথা যুগ-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন এ কারণেই অনিবার্য।

বুদ্ধের যুগে ভারতবর্ষে যাগ-যজ্ঞ-বলি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এক নির্মম অমানুষিকতায় পরিণত হয়েছিল– বুদ্ধের জীবন-দর্শন এ সবরেই মূর্ত প্রতিবাদ! তার যুগে তার মতো অত বড় সমাজ বিদ্রোহীর দ্বিতীয় কোন তুলনা নেই– তিনিই সর্বাগ্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সব রকম জীব-হত্যা, রহিত করলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্বীকার করলেন জন্মগত আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। তার শিষ্য আনন্দের জবানীতেই প্রকাশিত হলো তার বাণী এভাবে:

জন্ম হেতু কেহ কভু চণ্ডাল না হয়,
জন্মের কারণে কেহ ব্রাহ্মণ তো নয়।
চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আখ্যা কর্মে প্রাপ্ত হয়,
সম্বুদ্ধের বাণী ইহা জানিবে নিশ্চয়।
[শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির প্রণীত 'আনন্দ' পৃঃ ১৪১]

এভাবে আড়াই হাজার বছরেরও অধিককাল আগে মহামানব বুদ্ধ মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। জন্ম তো আকস্মিক ব্যাপার, তা নিয়ে গর্ব বা কৃতিত্বের দাবি চলে না। কর্ম তথা সৎকর্ম সজ্ঞান সাধনা আর ত্যাগ শ্রমের ফল- মানুষের স্বোপার্জিত সম্পদ। বুদ্ধ সে সম্পদেরই জয় ঘোষণা করেছেন। পড়ে পাওয়া বা আরোপিত গৌরব গৌরবই নয়– তেমন গৌরব ধার-করা, বাবুগিরির মতই সর্বনেশে। সেদিনের ভারত সমাজকে তিনি সে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন কর্মের

গৌরব ঘোষণা করে। পরবর্তী যুগে তার এ উদাত্তবাণী ভুলে ভারত-সমাজ যে আবার কর্মের আভিজাত্য ত্যাগ করে জন্মের আভিজাত্যে ফিরে গিয়েছিল তার বিষময় ফল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। দুঃখের বিষয় আজো এক বৃহৎ সম্প্রদায় এ বিষময় ও আত্মঘাতী ধারণা থেকে অব্যাহত পায়নি। মহাপুরুষেরা আলোকবর্তিকা, তারা মানুষকে পথ দেখিয়ে দেন, সে পথ ধরে চলার দায়িত্ব অবহেলা করলে তার ফলভোগী মানুষকে হতেই হবে। ভারতের বহু দুর্ভোগের অন্যতম কারণ যে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত।

এ বিংশ শতাব্দীতেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতায় এত উন্নতির যুগেও বহু দেশে ও বহু সমাজে মানুষ কর্ম বিচারকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্ম তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও গায়ের বর্ণকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের জীবনে ডেকে এনেছে বহু সঙ্কট। এর ফলে বহু সভ্য দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসও হয়েছে বারে বারে রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্কিত– এখনো হচ্ছে। বুদ্ধবাণী ও জীবন-দর্শন এসবের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদের প্রতি কান দিলে মানব-সভ্যতার অশেষ কল্যাণ হতো, মানুষ বেঁচে যেতো বহু দুঃখ-দুর্গতির হাত থেকে।

বুদ্ধ মানুষ আর মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন– তাই এমন কোন আদেশ-নিষেধ তিনি প্রচার করেননি যার ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ধ আনুগত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন– চিন্তার স্বাধীনতার মূল্য তিনি বুঝতেন ও দিতেন তার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির এক অকুণ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর অন্তিম বাণীতে, 'হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার মাত্রই ধ্বংসশীল। আপন কর্তব্য অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো। [আনন্দ : পৃঃ ২২৯]

অনেক সংস্কার মানুষের পক্ষে জগদ্দল পাথর হয়ে ওঠে– তার বাঁধনে অনেক সময় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে মানুষের মন, বিবেক ও বুদ্ধি। ফলে অপ্রমাদে কর্তব্য সম্পাদন হয়ে পড়ে অসম্ভব। ধর্ম-প্রচারকরা অনেক সময় নিজেদের ভক্ত আর শিষ্যদের মন আর বুদ্ধিকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে চান– বুদ্ধ তা চাননি, তিনি ভক্ত আর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন মন আর বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত রাখতে। তার নির্দেশ আর শিক্ষা বুদ্ধির মুক্তির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিগদর্শন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের মূল কথা: সব দুঃখের কারণ– তৃষ্ণা। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা লোভ সংবরণ তথা সর্ব আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হওয়াই চরম কাম্য। এ কাম্য ধামে পৌছার, বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলা হয় নির্বাণ, কয়টি মার্গ বা পথ তিনি নির্দেশ করেছেন সংক্ষেপে যার নির্গলিত অর্থ ঃ ইন্দ্রিয়দমন, স্বার্থত্যাগ ও স্থিরবুদ্ধি।

বলাবাহুল্য, এসবই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই– শুধু মনুষ্যত্ব বিকাশের নয় সব রকম দ্বন্দ্ব-বিরোধ পরিহারেরও এক রাজপথ। ব্যক্তিগত

পর্যায়ে যেমন, তেমনি সমষ্টিগত তথা জাতি ও সম্প্রদায়গত পর্যায়েও। স্থিরবুদ্ধি কথাটা খুবই মূল্যবান। স্থিরবুদ্ধি মানুষ কখনো কোন অপরাধ বা অঘটন ঘটাতে পারে না– পারে না নিজের বা অপরের দুঃখের কারণ হতে। যুদ্ধ- বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনাচার, অশান্তি সবই অস্থিরমতিদেরই কাণ্ড। ইন্দ্রিয়দমন ও স্বার্থত্যাগ এ দুই প্রাথমিক শর্ত পালন করেই মানুষ স্থিরবুদ্ধি হতে পারে। কাজেই এ তিন একসূত্রে গ্রথিত। 'মধ্যমা প্রতিপদা' অর্থাৎ মধ্যমার্গ ধরেই চলো, বুদ্ধের এ নির্দেশের সঙ্গে আমাদের ধর্মের শিক্ষার সঙ্গেও আশ্চর্য মিল রয়েছে। আমাদের ধর্মেও বলা হয়েছে– কোনো রকম বাড়াবাড়ি করো না, দুই চরম ত্যাগ করে মাঝামাঝি পথ ধরেই চলো। বলাবাহুল্য এও শান্তির পথ। বুদ্ধের যে শিক্ষা, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অহিংসা তথা সর্বজীবে দয়া। এ পথই যে বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কথা নয়।

মহামানব বুদ্ধ

একালে ধর্মই মানুষের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো– এখন সে দায়িত্ব অনেকখানি রাষ্ট্র, সমাজ আর বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। সব ধর্মকেই আজ এ ত্রয়ীর মোকাবেলা করতে হচ্ছে– এ মোকাবেলায় যে ধর্ম টিকে থাকতে পারবে না তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই, তার আবেদন ব্যর্থ না হয়ে পারে না। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তব চেতনা আর ঐহিকবোধ অনেক বেড়ে গেছে– শুধু পারলৌকিক ভালমন্দের আবেদনে আজ মানুষের মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। যে জীবনটা তার হাতের মুঠোয়, ওটার হিতাহিত নিয়েই তার এখন ভাবনা– কঠিন বাস্তব তাকে আর দিচ্ছে না আকাশচারী হতে। পরলোকের মুক্তির কথা ভেবে মানুষ আজ মোটেও বিচলিত নয়– এখন মানুষ মুক্তি চায় ইহলোকের দুঃখ দুর্গতি আর অভাব-অনটনের কবল থেকে। আজ মানুষ মানুষকে যতখানি ভয় করছে তার সিকির সিকিও ভয় করছে না ঈশ্বরকে কিংবা ঈশ্বরের দণ্ডকে। তাই পরলোকের ভয়ভীতি ও প্রলোভন আজ মানুষের জীবনে অনেকখানি অবান্তর। এ কারণে ধর্মের প্রতিও আজ নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে– ধর্মকেও আজ বিচার করতে হবে ঐহিক মাপকাঠি দিয়ে।

বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা পুরোপুরি ঐহিক ভিত্তিক বলে এ মাপকাঠি দিয়ে তার মূল্যায়ন অধিকতর সহজ– এর ফলাফল চাক্ষুস আর প্রত্যক্ষ! বুদ্ধ নিজেও কাল্পনিক ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করেননি। তেমন উপদেশ তিনি দেননিও। প্রতিদিন বাস্তব জীবনে যেসব সমস্যায় মানুষের অস্তিত্ব জর্জরিত তার অপনোদনের পথ আর উপায়–ই তিনি নির্দেশ করেছেন। আর তা কিছুমাত্র সাধ্যাতীত নয় মানুষের। কোন রকম অলৌকিক শক্তির দোহাই বুদ্ধ দেননি– জানাননি তেমন কিছুর প্রতি স্বীকৃতিও। সর্বোতোভাবে এ জীবনকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এর বৃত্ত ছড়িয়ে যাবার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। এ প্রত্যক্ষ জীবনকে ডিঙিয়ে অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ জীবনের স্বপ্ন তার কল্পনায় পায়নি স্থান। তার শিক্ষা, তার ধর্ম ও তার আবেদন এ জীবনের জন্যই। সমস্ত অবৈধ বাসনা-কামনার কবল থেকে মুক্ত করে এ জীবনকেই চেয়েছেন তিনি সুন্দর আর সুস্থ করে গড়ে তুলতে।

মানুষের অন্তরেই মানুষের সব দুঃখের বীজ নিহিত– এ মহাসত্যের তিনি আবিষ্কর্তা। আর তার মূল উৎপাটনই তার সব শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরলোকে স্বর্গ-নরক থাকলেও এ জীবনে তার কোন মূল্য নেই– কাজেই তার কথা ভেবে শঙ্কিত বা উচ্ছ্বসিত হওয়া বা তার উপর জোর দেওয়ার কোন মানে হয় না। তাই সে সম্বন্ধে মহামানব বুদ্ধ মোটেও মাথা ঘামাননি। তিনি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ। তার সব চিন্তা-ভাবনাও মানুষের জীবন-পরিধিতেই সীমিত। মানুষের এ জীবনের কল্যাণ আর এ জীবনের মুক্তিই তিনি চেয়েছেন– এ উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন তার জীবন আর জীবনের সবকিছু। সিদ্ধি খুঁজছেন এ জীবনের পরিমণ্ডলেই।

অন্য সব ধর্মেই ঈশ্বর, আল্লাহ, গড, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি এক বড় স্থান জুড়ে রয়েছে, আর রয়েছে পরলোকের সম্ভাব্য জীবন। একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষায় মানুষই বড় আর একমাত্র হয়েই দেখা দিয়েছে। সে মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র আর বিজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অলৌকিকতা এ জীবনে হালে পানি পায় না। তাই বোধ করি বুদ্ধের শিক্ষা ও আবেদনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা মানুষের তৈরি আর সর্বতোভাবে তা মানুষের জন্যই এবং মানুষকে নিয়েই। এদিক দিয়ে একে মানবধর্মই বলা যায় আর এ ধর্মের প্রবর্তককে সত্যার্থেই বলা যায় মহামানব। মহামানব বুদ্ধের জয় হোক। জয় হোক তার অহিংসা মন্ত্রের আর জীবন-চেতনার।

বুদ্ধ : এক আলোকবর্তিকা

বুদ্ধকে এক লেখায় আমি 'মানবপুত্র' বলেছি। কথাটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ। আর সে অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সার্বিক। মানব স্বভাবের এত গভীরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সত্যের সন্ধানে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করেছেন; কিন্তু প্রচলিত আত্মনির্যাতনমূলক সন্ন্যাসকে করেছেন নিন্দা। মানুষের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু অতিরেক আর অভিচারকে করেছেন নিষিদ্ধ। মানুষকে হতে বলেছেন মধ্যপন্থের অনুসারী। আর বলেছেন, এ হচ্ছে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' মানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা তথা Supreme Wisdom– যেখানে ভুল-ভ্রান্তির নেই কোন অনুপ্রবেশ।

প্রাণের অধিকারী বলে মানুষও প্রাণী– প্রাণহীন মানুষ স্রেফ জড় বস্তু, তখন জড় বস্তুর বেশি তার আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ, এক দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়– আরো অজস্র প্রাণী রয়েছে মর্তধামে। বুদ্ধি আর বিজ্ঞতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যুক্তি-যুক্তি বলে সব প্রাণই অমূল্য, শুধু মানুষের প্রাণটাই মূল্যবান এ বুদ্ধি কিম্বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অবিশ্বাস্য সাধনা আর দীর্ঘ আত্মনিবিষ্ট ধ্যানে মহামানব বুদ্ধ এ মহাসত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, সব প্রাণই মূল্যবান, সব প্রাণই পবিত্র। প্রাণ-হনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম– এমন কথা আড়াই হাজার বছর আগে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। মানবসভ্যতার তখনো শৈশবাবস্থা– জীবহত্যা তথা প্রাণী শিকার তখনো তার অন্যতম জীবিকা। যুবরাজ সিদ্ধার্থই ছিলেন এর প্রথম অপবাদক। তখন বীরত্বের বা ক্ষত্রিয় ধর্মের পরাকাষ্ঠাই ছিল মৃগয়া বা পশু-শিকার। সিদ্ধার্থও ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশাবতংস।

তাই, ভেবে অবাক হতে হয় তেমন যুগে তেমন পরিবেশে কি করে একটা মানুষের এমন রূপান্তর ঘটলো। কোন অলৌকিক কিংবা অপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় তিনি নেননি, যাননি তেমন অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রামাণ্য শক্তির কাছে। সর্বতোভাবে নির্ভর করেছেন আত্মশক্তির উপর, নিজের সাধনা আর আত্মোপলব্ধির

উপর। আত্মোন্মোচন ঘটেছে তার এভাবে। এভাবে ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম পৌঁছেছেন বুদ্ধত্বে। মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ- জীবন। ত্যাগ সংযমের পথে যে সাধনা তাই মূল্যবান ও ফলপ্রসূ। স্রেফ উপাসনা কিংবা কর্মহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, তা শুধু নিষ্ক্রিয়তা আর বড় অভ্যাসেরই দিয়ে থাকে প্রশ্রয়। এতে কোন আত্মোন্নতি ঘটে না, ঘটেনা কোন রকম আত্মোপলব্ধি। অপরিসীম আর অবিরাম চেষ্টা আর উদ্যম-উদ্যোগ ছাড়া আত্মোন্নতি কিংবা আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধিরই এক নাম প্রজ্ঞা। অন্যান্য বহু ধর্মে বিশ্বাসের রয়েছে এক বড় স্থান, বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয় ঐসব ধর্মে। বুদ্ধ তা করেননি। তার মতে কর্মহীন উপাসনা যেমন নিষ্ফল তেমনি নিষ্ক্রিয় জড় বিশ্বাস ও মূল্যহীন। মানুষের যা কিছু উপার্জন তা কর্মোদ্যমের পথেই লভ্য। জ্ঞানের তথা প্রজ্ঞা-পারমিতার যে আলোকবর্তিকা বুদ্ধ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাও তিনি লাভ করেছেন এ পথেই। মনে হয় বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে– ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেননি। তার জীবন ও শিক্ষা ব্যক্তিগত সাধনারই জয় ঘোষণা।

আত্মোপলব্ধির তথা প্রজ্ঞা-পারমিতায় পৌঁছার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেসবের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যাবে তিনি সর্বোতভাবে ব্যক্তিক সাধনার উপর দিয়েছেন জোর। দল বা সমাজবদ্ধভাবে আত্ম-উন্নতি ঘটে না, আত্ম-উন্নতি ঘটে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শ্রম আর সংযমের পথে। তার নির্দেশিত পঞ্চশীলের সবকটা শীলই ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয় ও পালনীয়। প্রাণীহত্যা, পরস্বাপহরণ, অবৈধ যৌন সম্ভোগ না করা, মিথ্যা পরনিন্দা কিংবা রূঢ় কথা না বলা, মদ আর নেশাজনক বস্তু গ্রহণ না করা– ব্যক্তিগত জীবনে সংযম আর ত্যাগ ছাড়া এসব হওয়ার নয়। আনুষ্ঠানিক উপাসনা আর প্রার্থনার সাহায্যে এসব আয়ত্ত হতে পারে না কিছুতেই।

বুদ্ধের এসব নির্দেশ পালন খুব কঠিন বটে কিন্তু এতে কোন রকম জটিলতা কিংবা দুর্জ্ঞেয়তা নেই, এ অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। রহস্যঘেরা দার্শনিক জটিলতাকে বুদ্ধ কোনদিন দেননি প্রশ্রয়। যেমন অনেক ধর্মের কোন কোন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন : মানুষ কে, কি? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এ ধরনের অর্থহীন তথা উত্তরবিহীন প্রশ্নকে বুদ্ধ কখনো আমল দেননি। এসব প্রশ্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু পারে না তাকে সৎজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বুদ্ধের তাবৎ কথা ও কাজের মূল লক্ষ্য সৎ মানুষ ও সৎ জীবনের পথ নির্দেশ। চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে ক্রমাগতই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও সমাজজীবনে বির্বতন ঘটে চলেছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস আর সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ এখন অধিকতর আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রগামী।

একদিন মানুষ জল-বাতাস-অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্যকে, এমনকি বজ্র আর মেঘগর্জনকেও দেবতা মানতো। কিন্তু এখন মানে না কেন? কারণ এখন মানুষের বোধ আর বোধি অনেক বেড়েছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তার মানব-জীবন হয়েছে অনেক উন্নত। বুদ্ধের শিক্ষা আর নির্দেশ জীবনে গৃহীত হলে মানুষের আরো যে আত্মবিকাশ ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এও বুদ্ধের এক অবিনশ্বর বাণী। এভাবে অতিপ্রাকৃত ও পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি।

কথা আছে : মানুষ প্রবৃত্তির দাস। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া মানুষ কখনো পরিপূর্ণ বোধ আর বোধিতে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র আত্মশুদ্ধির পথেই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব– সে পথের নির্দেশ রয়েছে বুদ্ধ-জীবনে, বুদ্ধের শিক্ষা আর বিধি-বিধানে, আদেশ আর নিষেধে।

মানুষ এখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে- বিজ্ঞানে অনেক সভ্য হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। তবুও পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। সংকটে, সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর এসব মারামারি, খুনোখুনিতে যে হারছে তার যেমন শান্তি নেই তেমনি শান্তি নেই জয়ী হচ্ছে যে তারও। ব্যক্তির বেলায় যেমন এ সত্য তেমনি দেশ ও জাতির বেলায়ও এ একবিন্দু মিথ্যা নয়। বুদ্ধ-শিষ্য অশোক জীবনের এ মহাসত্য দু'হাজার বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তার মন্ত্র-গুরু বুদ্ধের জীবনাদর্শ আর শিক্ষার আলো। তাই বিজয়ী হয়েও জয়ের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ত্যাগ আর অহিংসার জীবনকে নিয়েছিলেন বরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ।

বুদ্ধ-জীবন মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোকবর্তিকা– এ আলোকবর্তিকা একদিন সম্রাট অশোককে যেমন সত্য, মনুষ্যত্ব আর শান্তির পথ দেখিয়েছিল, আজকের দিনেও সে পথ দেখাতে তা সক্ষম যদি মানুষ সশ্রদ্ধ চিত্তে এ আলোক-বর্তিকার দিকে নতুন করে ফিরে তাকায় আর বরণ করে নেয় তাকে সর্বান্তঃ করণে।

বুদ্ধ আর বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের অর্থাৎ অ-বৌদ্ধদের মনে একটা রহস্য–ঘন বিস্ময় রয়েছে। এ বিস্ময়ের বড় কারণ অপরিচয়। বৌদ্ধ-বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যারা জন্মাননি তাদের কাছে বুদ্ধ-জীবন আর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়– বিরাট বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের মহাসমুদ্র মন্থনের যোগ্যতা, ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা আমাদের অনেকেরই নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে আমরা থেকে যাই অজ্ঞ। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় বহু অবিশ্বাস আর সংশয়-সন্দেহের যা কালক্রমে ঘৃণা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর নানা অশুভ ক্রিয়া-কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম-বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের গভীরতম

সত্তার সঙ্গে জড়িত- তাই কোন মানুষকে সম্যকভাবে জানতে হলে তার এ সত্তার সঙ্গেও পরিচয় অত্যাবশ্যক। সে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে যেমন নেই তেমনি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও তার অনুকূল নয়। এর ফলে আমাদের জ্ঞান যে শুধু খণ্ডিত থেকে যায় তা নয়, একটা সুসংহত জাতি কিংবা সমাজসত্তা গড়ে ওঠার পথেও আমাদের দেশে এ হয়ে আছে এক দূরতিক্রম্য বাধা। অন্তত জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান তথা ধর্মীয় গোঁড়ামি অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই এ অপরাধে অপরাধী।

মহামানব বুদ্ধের জীবন আর তার শিক্ষা আমাকে আকর্ষণ করে তার মানবিকতার জন্য। মানব চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে তিনি একদিকে খুঁজে বের করেছেন তার ক্লেদ, গ্লানি দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অন্যদিকে আবিষ্কার করেছেন তাতে অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ– যা অঙ্কুরিত হয়ে রূপ নিতে সক্ষম 'প্রজ্ঞা পরিপারমিতায়' অর্থাৎ পূর্ণ বিজ্ঞতায়। মানবিক শত বন্ধনে মানুষ বাঁধা যা সর্ব দুঃখ-কষ্ট আর শোক-সন্তাপের উৎস। এ বন্ধন-মুক্তির উপায় ও পথ বাৎলিয়েছেন বুদ্ধ। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, যার অর্থ : মানুষকে অধ্যয়ন করেই জানতে হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে জানার প্রধানতম উপায় মানুষকে জানা, মানুষকে অধ্যয়ন করা।

মহাপুরুষ বুদ্ধ তাই করেছেন। মানুষকে অধ্যয়ন করেই তিনি জেনেছেন মানুষের মুক্তির নিদান। প্রজ্ঞার বিদ্যুৎঝলক যে তার মনে সর্বপ্রথম ঝলসে উঠেছিল সে-ও তো পীড়িত, জরাগ্রস্ত আর মৃত মানুষকে দেখেই। যার ফলে মুহূর্তে শুধু যে তার ব্যক্তি জীবনে রূপান্তর ঘটে গেল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদঘাটিত হলো তার অন্তর্লোকে সত্যের, করুণার আর প্রেমের এমন এক সূর্য- করোজ্জ্বল দীপ্তি যার কোন তুলনা হয় না। এ মহাসত্যের পথ ধরেই শুরু হলো তার সাধনা– যে সাধনার লক্ষ্য মানুষ আর মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার রহস্য সন্ধান। সে সন্ধানে তিনি সফল হয়েছেন। হয়েছেন 'জিন' বা জয়ী। মানব সভ্যতার সূচনার যুগে এ সত্যই এক অবিস্ময়কর ঘটনা। এক রাজপুত্র, সুন্দরী স্ত্রী আর সদ্যোজাত সন্তানকে জীবনের জন্য ছেড়ে সত্যের ও মানবমুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে এক দুঃসহ বনজীবন বরণ করে নিয়েছেন মানুষের জন্য। এ তো এক অত্যাশ্চর্য শিহরণ। হয়তো মহাপুরুষদের জীবন এমনি অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়ই হয়ে থাকে। না হয় তারা মহাপুরুষ হলেন কি করে?

বুদ্ধ জীবনের মতো ত্যাগ সাধনা আর মনুষ্যত্বোপলব্ধির এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যই বিরল। বুদ্ধের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য নির্বাণ। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস– এ দাসত্বের চেয়ে হীনতম দাসত্ব আর নেই। এ বন্ধন মোচনের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন মানুষকে। এছাড়া ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। ভব-যন্ত্রণার হাত

থেকে চির মুক্তিরই এক নাম নির্বাণ। 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ'– এমন আপ্তবাক্যে বুদ্ধ বিশ্বাস করেন না। কর্মবিহীন বিশ্বাসতো স্রেফ নিষ্ক্রিয়তা, এতে প্রশ্রয় পায় জড়তা, শ্রম-বিমুখতা। বুদ্ধের শিক্ষা আর ধর্মের মর্মকথাই হলো– অবিরত আর অবিচলিত চেষ্টা। তিনি নিন্দা করেছেন অজ্ঞতা, লোভ আর হিংসা-বিদ্বেষকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসবকে জড়শুদ্ধ উৎপাটিত করার দিয়েছেন নির্দেশ। শুধু বিশ্বাস বা উপাস্য কিংবা আরাধ্যের নাম জপ করলে এ হওয়ার নয়। তাই বিশ্বাস কি উপাসনার উপর তিনি মোটেও জোর দেননি। কারণ ঐসবের মধ্যে ব্যক্তির কোন প্রচেষ্টা নেই, নিজেকে রূপান্তরিত করার নেই কোন প্রয়াস। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার চিন্তা, তার কথা, তার কর্ম। জড় অভ্যাস নয়। তাই মানুষ বিশ্বাসে তোতাপাখি হোক বুদ্ধ এ কখনো চাননি। মানুষ সক্রিয় হোক। প্রয়াসী আর উদ্যোগী হোক এ তিনি চেয়েছেন, দিয়েছেন তেমন বিধান। সন্ন্যাস এসবের বিপরীত, সন্ন্যাসও একরকম জড়তা। তাই কৃচ্ছ্র সাধনা ও সন্ন্যাস জীবনকেও তিনি করেছেন নিন্দা। সন্ন্যাস আত্মরতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অহংবোধ। এসবের অসারতা বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলেছেন– অকারণে শরীরিক কষ্টভোগ কখনো মুক্তির পথ নয়। নয় শান্তি কিংবা প্রজ্ঞার পথ। মানব মনের উন্মেষ আর বিকাশ যেখানেই ঘটেছে, তার সবই চেষ্টা, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের পথেই হয়েছে, তারই ফল এসব। স্রেফ উপাসনার দ্বারা এসবের কিছুই হয়নি। এ যাবত মানবসভ্যতার যা কিছু উন্নতি, তার সবই কর্ম, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের ফল। বুদ্ধের নিজের জীবনও ছিল তাই। এ পথেই তিনি মানব-মুক্তির মহাসনদ খুঁজে পেয়েছেন পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সম্পদ আর নেই– তাই প্রাণহননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধ তার কণ্ঠেই ধনিত হয়েছে সর্বাগ্রে। তিনি যে শুধু অহিংসা মন্ত্রই পৃথিবীকে শুনিয়েছেন তা নয়, সে সঙ্গে শুনিয়েছেন কর্ম উদ্যোমের বাণীও। ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে সম্ভবত তিনিই এমন দুঃসাহসিক কথা বলেছেন : Prayer is useless. For what is required is effort. The time spent on prayer is lost and the time spent on effort to achieve something is not lost. অর্থাৎ স্রেফ উপাসনায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা নিষ্ফল কিন্তু কোন কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় যে সময় ব্যয় করা হয় তাই ফলপ্রসূ।

এ মহামানব সব রকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই মানুষের প্রতি তার উদাত্ত আহ্বান : দূর করো পুরানো সংস্কারকে, বরণ করে নাও নতুনকে, পরিহার করো পাপ, শ্রেয়কে করো সঞ্চয়। সব রকম পাপ আর বাসনা কামনার বিরুদ্ধে করো বীর বিক্রমে সংগ্রাম। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ সকলের দৃষ্টি, এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে আকৃষ্ট হোক।

তথ্যসূত্র

নীরু কুমার চাকমা
বুদ্ধ ও তার ধর্ম ও দর্শন
প্রকাশক : পুষ্পরাণী
১১/এইচ ফুলার রোড, ঢাকা-১০০০

আনিসুজ্জামান, প্রধান সম্পাদক
সম্পাদনা পরিষদ :
আহমদ শরীফ
কাজী দীন মহম্মদ
মমতাজুর রহমান তরফদার
মুস্তাফা নূরুল ইসলাম
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)
প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দীনেশ চন্দ্র সেন
বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা-৭০০০৭৩

নীহার রঞ্জন রায়
বাঙালির ইতিহাস
আদিপর্ব
প্রকাশক : লেখক সমবায় সমিতি
৭০, বি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড,
কলকাতা- ২৬৩

Edited by Heinz Bechert and Richard Gombrich
The World of Buddhism
Published by Thames and Hudson Ltd.
London.

Thomas Watters
On yuan
Chwang's Travels in India AD 629-645
Published by Munshiram Manohar lal
Publishers Pvt Ltd.

আবুল ফজল
মানবপুত্র বুদ্ধ
প্রকাশক : পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

Nayaka Thera Piyadassi
The Buddhist Doctrine of life after death
Vajir ar ama, Colombo 5
Srilanka

BMBA
বাংলাদেশ মার্মা বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন
সম্বোধি
৮ই জৈষ্ঠ ১৪১২

চারুলতা পরিষদ ২০০৫-২০০৭
চারুলতা, প্রবারণা সংখ্যা
১০ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর ২০০৬

সিলেট বৌদ্ধ সমিতি
সিলেট
মৈত্রী-২০০৫

Kanai lal Hazra
Buddhism in India as described by the Chinese Pilgrims
AD 399-689
Munshhira Manokar Lal Publishers Pvt. Ltd.

আহমদ শরীফ
নির্বাচিত প্রবন্ধ
আগামী প্রকাশনী
৩৬, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

আমহদ শরীফ
ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আলি আহসান
চর্য্যাগীতিকার
বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

T.W. Rhys Davids
Buddhist India
T. Fisher Unwin
London
G.P. Putnam's Sons
Adelphi Terrace
New York.

বাংলাপিডিয়া ৪ এবং ৯ খণ্ড
প্রকাশক : এশিয়াটিক সোসাইটি

আবুল মনসুর আহমদ
আত্মকথা
প্রকাশক : খোরশেদ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার ঢাকা।

অন্নদা শঙ্কর রায়
নব্বই পেরিয়ে
দে' জ পাবলিশিং
কলকাতা-৭০০০৭৩

শরদিন্দু শেখর চাকমা

জন্ম ১৯৩৭ সালে, রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বর্তমান নানিয়াচড়া থানার অন্তর্গত বুড়ীঘাট মৌজার খুল্যাবিল গ্রামে। তার জন্মস্থান এখন কর্ণফুলী হ্রদের অতল তলে নিমজ্জিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ এম.এ. পাস করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় এম.এ. এবং প্রথম প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়ে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হতে প্রথম অতিরিক্ত সচিব হন। ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির একজন সদস্য করা হয়। শান্তিচুক্তির পরে ১৯৯৮ সালে তাকে ভূটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত করা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হতে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রদূত।

এস.এস. চাকমার স্ত্রী প্রীতি চাকমা। তারা এক পুত্র ও চার কন্যার জনক জননী।